১ মে ১৯৮৫ ☐ আনন্দবাজার প্রকাশন ☐ তিন টাকা

আপনার সোনাটির কোমল ত্বকে, আপনার স্নেহ-মধুর চুম্বনের মতই দেয় এ এঁকে!

জনসন্স বেবী সোপ, ছোট্ট সোনাদের
ছোট্ট দুনিয়ার নানান 'স্পেশাল' জিনিষের
মধ্যে এটিরও একটি স্থান রয়েছে।
জনসন্স বেবী সোপ-এ ল্যানোলিন মেশানো
থাকে ব'লে, এর পরশটি হয়ে ওঠে
মায়ের মমতাভরা মৃদু-কোমল পরশের মতই।
আর, এর কোমল-মধুর সুবাস, সারা অঙ্গে
ঘিরে থেকে, সোনাটিকে মাতিয়ে রাখে
শিশুসুলভ আনন্দের ধারায়!

জনসন্স বেবী সোপ
বিশুদ্ধ...মৃদু...নিরাপদ

Johnson & Johnson

© J&J

OBM/2193-BEN

আনন্দমেলা

১৮ বৈশাখ ১৩৯২ ▫ ১ মে ১৯৮৫ ▫ ১১ বর্ষ ২ সংখ্যা

বিশেষ রচনা
গুরু-দর্শন । সাগরময় ঘোষ ৫
বড়গল্প
রসা রোডের মোড়ে । প্রতুলচন্দ্র গুপ্ত ৩৫
গল্প
চাঁদ-চুরি । সুব্রত সেনগুপ্ত ১০
মোৎসার্টকাকুর বেহালা । গীতা চৌধুরী ২৭
যাত্রার একরাত । সমীর মুখোপাধ্যায় ৫৩
কীর্তিনাশা রজনীবাবু । বাণীব্রত চক্রবর্তী ৫৭
ধারাবাহিক উপন্যাস
কালো পর্দার ওদিকে । সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় ১৭
গোলমাল । শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায় ৫১
শার্লক হোমসের গল্প
নীলকান্তমণি-রহস্য । সুভদ্রকুমার সেন ৪৩
ছড়া ও কবিতা
ভীষ্মলোচন । অসিত ভট্টাচার্য ৫৫
ভোমরা । মায়া বসু ৫৬
মা'কে । তীর্থঙ্কর দাস পুরকায়স্থ ৫৬
উলটো-পালটা । রানা চট্টোপাধ্যায় ৫৬
বিজ্ঞানবিচিত্রা
মিল অমিল (এলাম আমি কোথা থেকে) । সুভাষ মুখোপাধ্যায় ২৬
জেনে নাও । অরূপরতন ভট্টাচার্য ২৬
লেখাপড়া
এবারও গল্প নয় (সহজে ইংরেজি) । প্রসাদ ৭
কবোষ্ণ…কম্বুগ্রীব (অর্থ জানো) । দেব-সেনাপতি ৭
মালদহ বার্লো বালিকা বিদ্যালয় । শ্যামলকান্তি দাশ ২২
খেলাধুলো
ফুটবলের কলকাতা । সুজয় সোম ৬২
শাবাশ ভারত । অশোক রায় ৬৩
বাহাদুর ছেলে কাঞ্ছা । কুশল রায় ৬৫
ঝাও-ঝড়ে ফ্রস্ট ফিনিশ । নৃপতি চৌধুরী ৬৬
চিত্রকাহিনী ও কমিক্‌স
টিনটিন ২০, রোভার্সের রয় ২৪, টারজান ৩১
সদাশিব ৪৮, গাবলু ৬১
অন্যান্য আকর্ষণ
ধাঁধা ৩২, শব্দসন্ধান ৩২, মজার খেলা ৩৩
হাসিখুশি ৩৩, তোমাদের পাতা ৪৯

প্রচ্ছদ : সুধীর মৈত্র

সম্পাদক : নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী

আনন্দবাজার পত্রিকা লিমিটেডের পক্ষে বিজিৎকুমার বসু কর্তৃক ৬ ও ৯ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০ ০০১ থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত। দাম তিন টাকা। বিমান মাশুল : ত্রিপুরা ১০ পয়সা; উত্তর-পূর্বাঞ্চলের অন্যান্য রাজ্যে ১৫ পয়সা। পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষা-অধিকার কর্তৃক অনুমোদিত শিশুপাঠ্য পত্রিকা

সব শিশুরই
এক সুর
গেঞ্জি পরুন
কোহিনুর

কোহিনুর নিটিং মিলস্‌
গেঞ্জি • জাঙ্গিয়া
প্রস্তুতকারক

আহ্, কি দারুণ অনুভূতি!

তরতাজা থাকার অনুপম
সুখানুভূতির মুহূর্তগুলি
আবেশঘন হয় নতুন পণ্ডস্
ড্রীমফ্লাওয়ার সাবান মেখে
স্নানের পরে...এ যে তাজা
ফুলের সুগন্ধে ভরপুর। আহ্ কি
দারুণ অনুভূতি!

নতুন
পণ্ডস্
ড্রীমফ্লাওয়ার সাবান

গুরু-দর্শন

সাগরময় ঘোষ

আমার শৈশব, বাল্যকাল আর কৈশোরের দিনগুলি একটানা শান্তিনিকেতনেই কেটেছে। গুরুদেব রবীন্দ্রনাথের দর্শন সেখানে, বলতে গেলে, নিত্যই পাওয়া যেত। তার মধ্যে দুটি দিনের স্মৃতি আমার চিত্তে আজও জ্বলজ্বল করে।

অনেকের ধারণা, শান্তিনিকেতনেই আমার জন্ম। সেটা কিন্তু ঠিক নয়। ১৯১২ সালে চাঁদপুরের বাজাপ্তি গ্রামে আমি এই পৃথিবীর আলো প্রথম দেখেছিলুম। আমার বাবা স্বর্গত কালীমোহন ঘোষ তার কিছুদিন আগে বিলেত যাত্রা করেছিলেন ; এডেনে পৌঁছে তিনি আমার ভূমিষ্ঠ হবার খবর পান। জাহাজে করে সাগর পাড়ি দিচ্ছেন, তাই চিঠি লিখে জানালেন যে, ছেলের নাম রাখা হোক 'সাগর'।

আমার বয়স যখন চার বছর, আর আমার দাদা শান্তিদেবের বয়স ছয়, তখন আমি প্রথম শান্তিনিকেতনে আসি। তোমরা অনেকেই তো সেখানে গিয়েছ। কিন্তু তখনকার শান্তিনিকেতন যে কেমন ছিল, এখনকার শান্তিনিকেতন দেখে তা তোমরা ভাবতেও পারবে না। ব্রহ্মচর্যাশ্রম, গুটিকয় ছাত্রাবাস, অধ্যাপকদের কয়েকটি খোড়ো-চালের বাড়ি, বাস্, এই নিয়েই ছিল তখনকার শান্তিনিকেতন। আর হ্যাঁ, আম্রকুঞ্জ আর শালবীথিও ছিল বই কী। আর ছিল 'শান্তিনিকেতন' নামে মস্ত একটা দোতলা বাড়ি। কাচ-মন্দিরের সামনে সেই বাড়িটি আজও তোমরা দেখতে পাবে। ওই বাড়ি আর মন্দির মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথই করিয়ে গিয়েছিলেন।

রবীন্দ্রনাথ তখন থাকতেন 'দেহলি' নামের ছোট্ট একটি বাড়ির দোতলায়। সেই বাড়ির কাছেই ছিল খোড়ো-চালের লাগোয়া তিনটি ঘর। তাতে থাকতেন ক্ষিতিমোহন সেন, নেপালচন্দ্র রায় আর কালীমোহন ঘোষ, এই তিন অধ্যাপকের পরিবারবর্গ। কাছাকাছি ছিলুম বলে রবীন্দ্রনাথকে আমার সেই নিতান্ত ছেলেবেলাতেও প্রায় নিত্যই দেখবার সৌভাগ্য হয়েছে। সেই অল্প-বয়সে দেখা রবীন্দ্রনাথের যে স্মৃতি আমার মনের মধ্যে আজও অম্লান হয়ে রয়েছে,

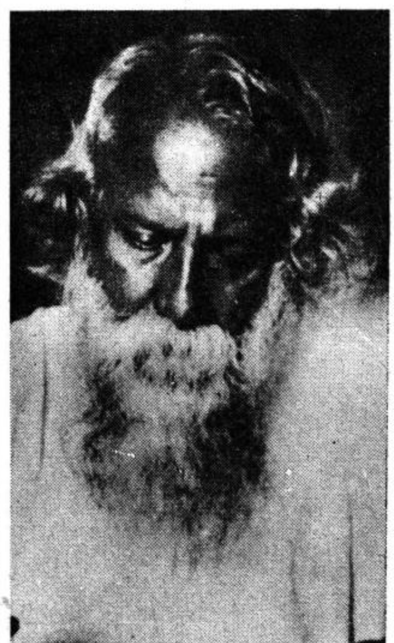

প্রথমে তারই কথা বলি।

'দেহলি'-বাড়ির দক্ষিণে ছিল 'দ্বারিক' নামের আর-একটি বাড়ি। পরে সেটি ভেঙে ফেলা হয়। সেই 'দ্বারিক'-বাড়ির দোতলায় রোজ সন্ধ্যায় সমবেত হতেন আশ্রমের গৃহিণীরা। তাঁরাই ছিলেন আশ্রমজননী। কেন তাঁরা ওখানে সমবেত হতেন জানো ? রবীন্দ্রনাথ সেখানে 'গোরা' উপন্যাসের পাণ্ডুলিপি পাঠ করে তাঁদের শোনাতেন। একে তো কাহিনীর টান, তার উপরে আবার স্বয়ং গুরুদেব সেই দীর্ঘ কাহিনী পাঠ করে শোনাচ্ছেন, ঘরের কাজ চটপট সেরে নিয়ে প্রতিটি সন্ধ্যাতেই তাই আশ্রমজননীদের সেখানে হাজির হওয়াই চাই, একটি দিনের তরেও তাঁদের কাউকেই সেই আসরে গর-হাজির হতে দেখা যেত না।

বলা বাহুল্য, আমার মা'ও সেখানে নিত্য যেতেন। আমি তখন খুব ছোট, বাড়িতে আমাকে রেখে যাবার উপায় নেই, তাই আমাকে সঙ্গে নিয়ে যেতেন তিনি। মা শুনতেন গল্প। কিন্তু আমার তো তখন গোরার গল্প শুনে উপভোগ করবার মতো বয়েস হয়নি, মায়ের পাশে তাই আমি চুপটি করে বসে থাকতুম, আর মুগ্ধ বিস্ময়ে দেখতুম সেই দেবদর্শন মানুষটিকে। শান্তিনিকেতনে তখনও বিজলি-বাতি আসেনি, টুলের উপরে তাই কেরোসিনের একটি সেজবাতি জ্বলত, আর সেই টুলের পাশে একটি আরামকেদারায় বসে রবীন্দ্রনাথ তাঁর উপন্যাসের পাণ্ডুলিপি পড়ে যেতেন।

সেই আবছা আলো, সেই আশ্চর্য সুন্দর কান্তি, সেই মধুর কণ্ঠস্বর। দৃশ্যটা আজও আমার চোখে ভাসছে, আর কানে লেগে আছে সেই মধুর কণ্ঠের রেশ। গুরুদেবকে দেখতে-দেখতে আর তাঁর পাঠ শুনতে শুনতে মায়ের কোলে আমি ঘুমিয়ে পড়তুম।

এর পরে নানা উপলক্ষে নানা অনুষ্ঠানে রবীন্দ্রনাথকে দেখেছি। দেখেছি, তিনি স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছেন আম্রকুঞ্জের ছায়ায়, কিংবা দীর্ঘ পদক্ষেপে পার হয়ে যাচ্ছেন শালবীথি। নানা নাটকে তাঁকে অভিনয় করতে দেখেছি, আবার দেখেছি অভিনয়ের ব্যাপারে অন্যদের তালিম দিতে। তা ছাড়া, প্রতি বুধবারে থাকত উপাসনা-অনুষ্ঠান। ধপধপে সাদা ধুতিপাঞ্জাবি পরে সেই অনুষ্ঠানে তিনি ভাষণ দিতেন। আবার হঠাৎ-হঠাৎ এসে ক্লাসও নিতেন তিনি। কখনও পড়াতেন ইংরেজি, কখনও ইতিহাস, কখনও শারীরতত্ত্ব। 'শারদোৎসব' আর 'ফাল্গুনী'তে তিনি অভিনয়ের দলকে যত্ন করে, ধৈর্য ধরে গান শেখাচ্ছেন, তাও দেখেছি। মনে পড়ে যে, ছেলের দলও তখন দারুণ উৎসাহে সেখানে যোগ দিত। কতভাবে কতদিন যে তাঁকে দেখেছি, তার কোনও হিসেব নেই।

কিন্তু সেই অসংখ্য দেখার মধ্যেও আর-একটি যে দেখার স্মৃতি আমার চিত্তে আজও উজ্জ্বল দীপশিখার মতো জ্বলছে, এবারে তার কথা বলি শোনো। আমি তখন ক্লাস নাইনের ছাত্র। ডিসেম্বর মাস। সামনেই বার্ষিক পরীক্ষা। আমি আর আমার দুই সহপাঠী হরপ্রসন্ন দাশগুপ্ত আর উদয় সেন তাই রাত জেগে পরীক্ষার পড়া তৈরি করতে হিমশিম খেয়ে যাচ্ছি। পড়তে-পড়তে রাত গভীর হয়, চোখের পাতা ঘুমে জড়িয়ে আসে। ঘুম তাড়াবার জন্যে চায়ের সরঞ্জাম আমরা হাতের কাছেই মজুত করে রাখতুম। চা, চিনি, দুধ আর কেতলি ছাড়া স্টোভও ছিল একটা। ঝিমুনি এলেই মহা উৎসাহে আমরা চা বানাতে বসে যেতুম।

চা খেতে-খেতেই হরপ্রসন্ন একদিন বলল, "দ্যাখ্, গুরুদেব তো আমাদের বলেন যে, রোজ শেষ-রাত্তির সাড়ে চারটের সময় ঘুম থেকে উঠতে হবে, তারপর ঘর ঝাঁট দিয়ে, বিছানা তুলে, উপাসনায় বসতে হবে। তারপর অন্য সব কাজকর্ম সেরে তৈরি হতে হবে ক্লাসে যাবার জন্যে। কিন্তু গুরুদেব নিজে কি অত ভোরে ঘুম থেকে ওঠেন ?"

উদয় বলল, "সত্যিই তো, তিনি নিজে ওঠেন কি ?"

হরপ্রসন্ন বলল, "সেটাই একবার যাচাই করে দেখা দরকার।"

কীভাবে যাচাই করা হবে ? তিনজনে মিলে পরামর্শ করে ঠিক করা হল যে, সেইদিনই শেষ রাতে আমরা উত্তরায়ণের পুবদিকের জামগাছটার তলায় গিয়ে কম্বল মুড়ি দিয়ে বসে থাকব, আর সেখান থেকে লক্ষ করব যে, গুরুদেব কী করেন। যে কথা, সেই কাজ। শেষ রাত্তিরের হুহু শীতে বিছানা থেকে কম্বল টেনে নিয়ে, গায়ে-মাথায় ভাল করে জড়িয়ে, আমরা তো ঘর থেকে বেরিয়ে পড়লুম, তারপর নিঃশব্দে গিয়ে বসলুম সেই জামগাছের তলায়। ঘড়িতে তখন চারটে বাজে।

আশ্চর্য ব্যাপার, আমরাও সবে বসেছি, অমনি দেখলুম যে, উদয়ন-বাড়ির একতলার দক্ষিণ দিকের ঘরের মধ্যে আলো জ্বলে উঠল। স্তব্ধ হয়ে আমরা তাকিয়ে রইলুম সেই ঘরের সংলগ্ন পুবের বারান্দার দিকে। পাঁচ মিনিট ... দশ মিনিট ... পনরো মিনিট। একটিও কথা নেই আমাদের মুখে। ঠিক আধ ঘণ্টা বাদে, কাঁটায় কাঁটায় সাড়ে চারটের সময়ে গুরুদেব বেরিয়ে এলেন তাঁর ঘর থেকে। বারান্দায় এসে, পূর্বাস্য হয়ে, একটি চেয়ারে বসলেন।

আবছা অন্ধকারের মধ্যে তাঁর দিকে তাকিয়ে রয়েছি আমরা, আর সারা শরীরে অনুভব করছি অদ্ভুত এক শিহরন। গুরুদেবকে দেখে আমাদের মনে হচ্ছিল, জীবন্ত মানুষ নন, পাথর কুঁদে তৈরি করা এক স্তব্ধ-অনড় ঋজু সটান বিশাল মূর্তি। পূর্বাকাশের দিকে চোখ রেখে, ধ্যানস্থ হয়ে তিনি বসে আছেন।

এইভাবেই কেটে গেল ঘণ্টাখানেক সময়। তারপর পুবের আকাশে দেখা দিল উষার অস্পষ্ট আভা। তারও পরে রেল-লাইনের ওদিকে, দিগন্তরেখার উপরে উঁকি দিলেন জবাকুসুমের মতন টকটকে লাল সূর্যদেব। আর তখনই আস্তে-আস্তে চেয়ার থেকে উঠে গুরুদেব তাঁর ঘরের দিকে পা বাড়ালেন।

জানি না, ওই যে তিনি স্তব্ধ হয়ে অতক্ষণ বসে ছিলেন, কী ভাবছিলেন তখন তিনি। তিনি কি সারাটা দিনের হাজার কাজকর্মের জন্য তখনই নিজেকে তৈরি করে নিচ্ছিলেন ? না কি তাঁর চিত্তে তখন জমাট বাঁধছিল অন্য কোনও চিন্তা ?

আবার বলি, এ-সব কথার উত্তর আমার জানা নেই। আমি শুধু এইটুকুই বলতে পারি যে, সূর্য-সন্দর্শনের প্রতীক্ষায় নিরত ধ্যানগম্ভীর সেই মূর্তি আমার মনশ্চক্ষে আজও ভাসছে।

এবারও গল্প নয়

ইংরেজি তো আমাদের নিজেদের ভাষা নয়, তাই আমাদের প্রায় সকলকেই কষ্ট করে, চেষ্টা করে শিখতে হয়। যেমন করে ইতিহাস, ভূগোল এইসব শিখি, অনেকটা সেই রকম করে শিখতে হয়।

ইংরেজির মতো বিদেশী ভাষাও যদি আমরা তেমনি ভাবে নিজেদের অজান্তেই শিখে ফেলতে পারতাম, কী মজা হত বলো তো ? কিন্তু তা যখন হবার নয়, তখন কষ্ট করেই শিখতে হবে। কিন্তু সে-কষ্টটা কম হয়, শেখাটাও ভাল হয়, যদি, যা আমাদের পড়তে ভাল লাগে, যেমন ধরো গল্পের বই-টই, তা-ই পড়তে পড়তে আমরা ভাষাটা শিখে চলি।

তাতে একটা কী মস্ত বড় সুবিধে হয় জানো ? যে কথাটা ইংরেজিতে যেমন ভাবে বলে, দেখতে দেখতে সেটাই অভ্যাস হয়ে যায়। তখন নিজের কাছে সেইটেই স্বাভাবিক মনে হয়, ব্যাকরণ পড়ে নিয়ম শিখবার দরকার করে না। একটা খুব সহজ উদাহরণ দিই।

ব্যাকরণের নিয়মে আছে, ইংরেজিতে ক্রিয়াপদ ছাড়া বাক্য হয় না। তোমার কিন্তু ইংরেজি বই পড়ে পড়ে আর অন্যদের কাছে শুনে শুনে এমনিতেই অভ্যাস হয়ে গিয়েছে, ক্রিয়াপদ আপনি এসে পড়ে। তুমি বলো :

This is my book.
Which is yours?
Whose book is this?
Is it yours?

অথচ সেই তুমিই আবার বাংলা বলবার সময় বলবে :

এইটা আমার বই।
তোমার কোন্‌টা ?
এই বইটা কার ?
এটা কি তোমার ?

এতগুলো কথা হয়ে গেল, ক্রিয়াপদের চিহ্নও দেখা গেল না কোথাও। আসলে এক-এক ভাষার ধরনধারণ এক-এক রকম, সেটা অভ্যাস করতে হয়, পড়তে হয়, লিখতে হয়, বলতে হয়। তা না হলে অনবরত ভুল হতে থাকে।

প্রশ্নবোধক বাক্যতে এই রকম ভুল আমাদের বড্ড বেশি হয়। বাংলাতে প্রশ্নবোধক বাক্যে শব্দগুলো জায়গা বদল করে না।

আমি বাড়ি যাব।
তুমি বাড়ি যাবে ?

আর ইংরেজিতে ?

I'll (I will) go home.
Will you go home?

তেমনি আবার

I was doing nothing.
What were you doing?
I saw (did see) nothing.
What did you see?

প্রসাদ

কবোষ্ণ...কম্বুগ্রীব...

শব্দের অর্থ জানার আনন্দ অচেনার আনন্দের মতো। একটা নতুন দেশ আবিষ্কারের আনন্দের চেয়ে তা কোনও অংশে কম নয়। শব্দের অর্থ জানায় এক অদ্ভুত উত্তেজনা আছে। নীচের শব্দগুলি আমাদের খুবই পরিচিত। প্রতিটি শব্দের পাশে কয়েকটি আনুমানিক অর্থ দেওয়া আছে। যেটি ঠিক মনে হবে, তাতে দাগ দেবে। সবশেষে উত্তরের সঙ্গে মেলাবে। শব্দের অর্থও ঠিক জানতে পারবে।

১। **শৈলী**—(ক) শিলাময় স্থান। (খ) রীতি। (গ) শৈলমালা। (ঘ) ক্ষুদ্র শিলা।

২। **কবোষ্ণ**—(ক) উষ্ণতাহীন। (খ) অত্যধিক উষ্ণ। (গ) অল্প উষ্ণ। (ঘ) ক্বচিৎ উষ্ণ।

৩। **পূর্বাশা**—(ক) পূর্বের আশা। (খ) পূর্ব দিক্। (গ) যে আশা পূর্ণ হয়েছে। (ঘ) প্রাচীন কালের আশা-আকাঙ্ক্ষা।

৪। **মঞ্জু**—(ক) যা মন রাঙায়। (খ) মঞ্জরি। (গ) যে মন জয় করে। (ঘ) সুন্দর।

৫। **কম্বুগ্রীব**—(ক) যার দীর্ঘ গ্রীবা। (খ) যার ঘাড় ছোট। (গ) শঙ্খের মতো গ্রীবা যার। (ঘ) যার গলার স্বর ক্ষীণ।

উত্তর : ১। **শৈলী**—(খ) রীতি। বাংলায় ওই একটি অর্থই কেবল প্রচলিত। যেমন, বঙ্কিমচন্দ্রের অপূর্ব রচনাশৈলী। ২। **কবোষ্ণ**—(গ) অল্প উষ্ণ। কু অর্থাৎ ঈষৎ উষ্ণ। যেমন—কবোষ্ণ দুগ্ধ। ৩। **পূর্বাশা**—(খ) পূর্ব দিক্। আশা শব্দের একটি অর্থ দিক্। যেমন—'পূর্বাশার প্রান্তদেশে নবোদিত অরুণের মতো' (রবীন্দ্রনাথ)। ৪। **মঞ্জু**—(ঘ) সুন্দর বা মধুর। যেমন—'বীণাগুঞ্জিত মঞ্জুভাষিণী কমলকুঞ্জাসনা' (রবীন্দ্রনাথ)। ৫। **কম্বুগ্রীব**—শঙ্খের মতো গ্রীবা যার। কম্বু শব্দের অর্থ শঙ্খ। শঙ্খের মতো রেখাযুক্ত গ্রীবা অথবা শঙ্খের মতো উচ্চ কণ্ঠস্বর যার এই অর্থে ব্যবহার করা হয়। যেমন 'কম্বু জিনিয়া কেবা কণ্ঠ বনাইল রে' (চণ্ডীদাস)।

দেব-সেনাপতি

"বুঁদির কেল্লা চিতোর হতে যোজন তিনেক দূর।" ২০ মার্চের আনন্দমেলায় 'অর্থ জানো' বিভাগে বলা হয়েছিল, এটি রবীন্দ্রনাথের 'পণরক্ষা' কবিতার পঙ্‌ক্তি। তা কিন্তু নয়। আসলে এই পঙ্‌ক্তি আছে 'নকল গড়' কবিতায়। ষষ্ঠ শ্রেণীর ছাত্র শ্রীমান দীপ্তেন্দু ঘোষকে ধন্যবাদ, সে-ই আমাদের ভুল শুধরে দিয়েছে।

INTAS I.R-42-2739 BG

নতুন লিরিল
তরতাজা করা এক নতুন অনুভব!
লিরিল অনন্য নতুন রূপে!
মন কেড়ে নেওয়া
এক অপরূপ নতুন সুরভিতে...
আকর্ষণীয় নতুন প্যাকে।
NEW
Liril
THE FRESHNESS SOAP
Liril
নতুন
লিরিল
তরতাজা হবার সাবান
আপনাকে পরিণত করে লাবণ্যে
ঢলঢল নারীতে!
হিন্দুস্থান লিভার-এর উৎকৃষ্ট উৎপাদন।

চাঁদ-চুরি

সুব্রত সেনগুপ্ত

লখাই বনের পথে একা-একা যাচ্ছিল। হাঁটছে সেই সকাল থেকে। দেখতে দেখতে দিনের আলো নিভে চারপাশ অন্ধকারে ঢেকে গেছে। লখাই চলেছে তার বাবার খোঁজে। বাবা কোথায়, লখাই তা ঠিক জানে না। সে খুঁজতে-খুঁজতে চলেছে। চলতে-চলতে খুঁজছে। এদিকে ক্লান্তিতে পা আর সরছে না। রাতও বেড়ে চলেছে। শেষে লখাই একটা গাছের নীচে বসে পড়ল।

সেই গাছে থাকত দুটো ভারী ভাল পাখি। নীচে বসা লখাইকে দেখে এক পাখি অন্যকে বলল, "কিচি মিচি কিচির—খিদে পেয়েছে বেচারির।" অন্য পাখি উত্তর দিল, "মিচি কিচি কিচি—দুজনে দুটো ফল ফেলে দি।"

পাখি দুটো ঠুকরে-ঠুকরে দুটো ফল ফেলে দিল। ফল দুটো গিয়ে পড়ল একেবারে লখাইয়ের কোলের ওপর। সে চমকে ওপরের দিকে তারপর চারপাশে তাকাল। ফল দুটো হাতে তুলে নিয়ে গন্ধ শুঁকল। বাঃ, চমৎকার মিষ্টি—গন্ধেই যেন স্বাদ বোঝা যাচ্ছে!

লখাই ভাবল, বিশ্রাম করতে এমন গাছের তলা, খিদে পেতে এরকম মিষ্টি ফল! এ তো অদ্ভুত জায়গা! না জানি আরও ভাল কত কিছু এখানে আছে!

পা ছড়িয়ে বসে সে ফল খেতে লাগল। খেতে খেতেই দেখতে পেল, সামনেই বিরাট একটা পুকুর। পুকুরে নিশ্চয় ঠাণ্ডা মিঠে জল পাওয়া যাবে। উৎসাহে সে তার হাতের ফলে আর একটা বড় কামড় দিল, আর তখনই তার চোখে পড়ল পুকুরের একধারে জলের মধ্যে চকচকে বিরাট একটা কী স্থির হয়ে আছে। কী রে? এক লাফে সে উঠে দাঁড়াল। গোল উজ্জ্বল ওটা কী? লখাই পুকুরের কাছে ছুটে গেল। আকাশের চাঁদটা কি জলে পড়ে গেল নাকি? এরকম কাণ্ডের কথা সে তো কোনও দিন কারও কাছে শোনেনি। তবে যে-জায়গায় খিদে পেলে আকাশ থেকে কোলের ওপর টুপটুপ করে ফল পড়ে, তেষ্টা পেতেই চোখের সামনে জলে ভর্তি পুকুর দেখা যায়, সেখানে সবই সম্ভব। চাঁদটা হয়তো পিছলে আকাশ থেকে পড়েছে। ভাগ্যে কারও মাথায় পড়েনি। পড়লে আর রক্ষা থাকত না। হয় তার মাথা-ঘাড় ভাঙত, নয়তো সে পুড়েই মরত হয়তো। আর হাটে-গঞ্জে পড়লে এতক্ষণ আর দেখতে হত না। মারামারি কাড়াকাড়ি পড়ে যেত। চাঁদ নিয়ে নির্ঘাত লড়াই লেগে যেত। টানাটানি কামড়াকামড়ি করে সবাই মিলে এমন সুন্দর চাঁদটাকে ছিঁড়ে কুটিকুটি করে ফেলত। যে যার বাড়িতে এক টুকরো চাঁদ নিয়ে যেত। আর তা করতে গিয়ে কত লোকের প্রাণ যেত, কত জনের হাত পুড়ত, গা পুড়ত।

আজ সত্যি একটা ভাল দিন। চাঁদটা বেছে-বেছে বনের মধ্যে এই পুকুরে পড়েছে। যেখানে লখাই ছাড়া আর কেউ নেই। আর পড়েছে দ্যাখো ঠিক জায়গায়। ফলের বদলে

আকাশ থেকে চাঁদটাই যদি তার কোলে পড়ত, তবে কি তার হাড়গোড় আর আস্ত থাকত। গাছের ওপর কি মাঠেও পড়তে পারত। কিন্তু গাছ থেকে চাঁদ পাড়তে গেলে, কি মাঠ থেকে তুলে নিতে গেলে নিদেন পক্ষে তার হাত দুটো তো পুড়তই। কিন্তু চাঁদটা বুঝেশুনে পড়েছে পুকুরের জলে। জলে থেকে থেকে ওটা এতক্ষণে নিশ্চয় ঠাণ্ডা হয়ে গেছে। এখন চাঁদটাকে অনায়াসে বগলদাবা করে নিয়ে যাওয়া যাবে। কিন্তু না। ওভাবে নেওয়া যাবে না। এক নম্বর, চাপ লাগলে চাঁদটা ভেঙে যেতে পারে। অত উঁচু থেকে পড়েছে, তাতে কি আর চিড়টিড় ধরেনি? দু' নম্বর কথা হল, ওভাবে নিয়ে গেলে সবাই দেখতে পাবে, লখাই বগলদাবা করে চাঁদটা নিয়ে যাচ্ছে। ধর ধর মার মার করে সবাই ছুটে আসবে। তখন? লখাই তার চেয়ে কোঁচড়ে করে চাঁদটা নিয়ে যাবে। কিন্তু পাতলা কোঁচড় থেকে যদি চাঁদের আলো বেরিয়ে পড়ে? তা হলে লখাই গায়ের চাদরটাও খুলে নিয়ে ভাল করে ঢেকে নেবে। হুঁ হুঁ, লখাইয়ের বুদ্ধি কি কারও চাইতে কম নাকি?

লখাই এক পা এক পা করে পুকুরের দিকে এগিয়ে গেল। এতক্ষণ একটা কথা ভাবা হয়নি। চাঁদটা যদি পালাতে চেষ্টা করে? যদি ভুল করে এক ডুবে পুকুরের একেবারে নীচে চলে যায়, বা হুশ করে উড়ে আবার আকাশে উঠে যায়, বা ডাঙায় উঠে গড়গড় করে গড়িয়ে ছুটতে থাকে? না, সেটি হচ্ছে না। সবাই লখাইকে বোকা ভাবলেও সে মোটেও তা নয়। সব চাইতে দুঃখ লখাইয়ের মা'ও যখন-তখন বলে, তার মতো বোকা নাকি দুনিয়ায় নেই। এবার সে দেখিয়ে দেবে, কে বোকা আর কে চালাক। চাঁদটা সঙ্গে নিয়ে সে যখন বাড়ি ফিরে যাবে, তখন মায়ের চোখ দুটো ছানাবড়ার মতো হয়ে যাবে না?

চাঁদ বিক্রি করে নিশ্চয় অনেক টাকা পাওয়া যাবে। লখাই টাকা-পয়সা খুব একটা চোখে দেখেনি। অনেক টাকা সম্পর্কে তার ঠিক ধারণা নেই। চাঁদের বাজারদর কত, তা-ই বা সে জানবে কী করে? ফলে কত টাকা পাওয়া যাবে বুঝতে না পারলেও তার মনে হয়, এর পর তার আর তার মায়ের খাওয়া-পরার দুঃখ থাকবে না। বাবাকেও বিদেশ-বিভুঁইয়ে ঘুরে মরতে হবে না। চাঁদ বিক্রি হয়ে গেলে সে খবর এ-গ্রাম ও-গ্রামে ছড়িয়ে পড়বে। বাবাও শুনতে পেয়ে ঘরে না ফিরে পারবে না।

পুকুরের জলে পা দেওয়ার আগে লখাই আর-একবার ভাল করে চাঁদটার দিকে তাকাল। তারপর খুব সাবধানে পা বাড়াল। জলে পা পড়তেই, হায় হায়, চাঁদটা...মানে চাঁদের ছায়া...ভেঙে টুকরো-টুকরো হয়ে ছড়িয়ে পড়ল।

লখাই কাঁদতে লাগল, এ কী করলাম আমি, কী করলাম। সে পাগলের মতো হাত বাড়িয়ে টুকরোগুলো ধরার চেষ্টা করতে লাগল। ধরেছি ভেবে যতবারই সে হাত মুঠ করে, মুঠো থেকে জল গড়িয়ে পড়ে যায়। সে দু-হাত বাড়িয়ে শক্ত করে ধরার চেষ্টা করে, বুকে চেপে ধরতে চায়, কিন্তু পারে না।

লখাই গায়ের চাদর খুলে জল ছেঁকে চাঁদের টুকরোগুলো তোলার চেষ্টা করে। কিন্তু চাদর তুলে আনতে দ্যাখে কিছু নেই। আর জল যত নাড়া হচ্ছে, চাঁদ তত জলের সঙ্গে মিশে যাচ্ছে। শেষে...

শেষে লখাই ডাঙায় উঠে কাঁদতে কাঁদতে ভাবতে লাগল, এরকম হল কেন? হঠাৎ তার মনে হল, সে এখানে আসার পর থেকেই অদ্ভুত সব ঘটনা ঘটছে। আকাশ থেকে ফল পড়ে, জলের মধ্যে চাঁদ ঘাপটি মেরে বসে থাকে, কোথাও

ম্যাগী স্কেচ পেন আবার এসে গেছে!
বিনামূল্যে!
12টি সুন্দর রঙ্গীণ স্কেচ পেনের একটি সেট 12টি (★) তারকা চিহ্নের খালি ম্যাগী নুডলস্ প্যাকের বিনিময়ে।
আমাদের ডিষ্ট্রিবিউটারের কাউণ্টারে (ঠিকানা আপনার ডীলার জানেন) অথবা আপনার ডীলারের মাধ্যমে এগুলি বিনিময় করুন। তাঁরা কয়েকদিনের মধ্যেই আপনাকে স্কেচ পেন দেবার ব্যবস্থা করবেন।
বাছা বাছা কয়েকটি সহরেই কেবল এই সুযোগ সীমিত।
তাড়াতাড়ি আসুন!
স্কেচ পেনের স্টক কিন্তু সীমিত।
MAGGI
2-Minute noodles
NEW
MAGGI ®
2-Minute noodles
with Masala
Tastemaker inside
Fast to cook! Good to eat!
রান্না হয় তাড়াতাড়ি! খেতে লাগে মজাদারী!
FSL-864 BEN

কেউ শুনেছে কোনও দিন ? এখানে নিশ্চয় কোনও জাদুকরের জাদু আছে। নয়তো এটা ভূতের এলাকা। সে ভয় পেয়ে আচমকা 'বাবা গো' বলে চিৎকার করে উঠল।

এদিকে হয়েছে কী, সেই বনের পথ দিয়ে তখন যাচ্ছিল একটা চোর। সে রোজ রাতে চুরি করে যা পেত, ওই পুকুরপাড়ে একটা জায়গায় মাটির নীচে পুঁতে রাখত। ইচ্ছে, বেশ কিছু টাকা জমলে সে দেশের বাড়িতে ফিরে যাবে, যেখানে আছে তার গিন্নি আর ছেলে লখাই। তার ছেলে লখাই যে তাকেই খুঁজতে এসে এই পুকুরপাড়েই বসে আছে, তা তো সে জানে না। তবু 'বাবা গো' শুনে সে থমকে দাঁড়াল। আবছা আলোয় দেখতে পেল, একটা ছেলে বসে আছে। কী ব্যাপার ? তার লুকনো টাকার খবর পেয়ে ছেলেটা এখানে বসে আছে নাকি ? সে তাড়াতাড়ি ছুটে এল। এসে দেখে, আর-কেউ নয়, এ কী, এ যে তার ছেলে লখাই। লখাইও দ্যাখে, হঠাৎ ছুটে আসা লোকটা কোনও জাদুকর নয়, ভূতও নয়, তার বাবা। দু'জন দু'জনকে জড়িয়ে ধরে অনেক কথা বলল, বলতে বলতে লখাইয়ের চোখে পড়ল, শান্ত জলের মধ্যে আবার সেই আস্ত চাঁদ—তেমনি বিরাট, তেমনি সুন্দর। সে তখন তার বাবাকে তার চাঁদ চুরির চেষ্টার কথা আর চুরি করতে গিয়ে কী হয়েছিল, সব বলল। সব শুনে তার বাবা বলল, চাঁদটাকে দেখলে তো মনে হয়, বোকাসোকা ভালমানুষটি। ভাজা মাছটিও উল্টে খেতে জানে না যেন। সে ব্যাটা এত চালাক। দাঁড়াও দেখাচ্ছি মজা।

বলে বাপ-বেটা যুক্তি করে এক সঙ্গে পুকুরে ঝাঁপ দিল। আর সঙ্গে সঙ্গে চাঁদ আবার টুকরো টুকরো হয়ে গেল। লখাই আর তার বাবা তখন পাড়ে উঠে ভাবতে লাগল, কী করা যায় ? তাই তো, এই দেখছি আস্ত চমৎকার একটা চাঁদ। যত খুশি দ্যাখো, কিন্তু যেই ধরতে গেলে, অমনি ভেঙে টুকরো টুকরো। হাত মুঠ করে ধরো—নেই। শেষে লখাইয়ের বাবা বলল, "ওরে, ওটা বোধহয় যখের ধন। পুকুরেই ওর শোভা। দেখতে পারো, ছুঁতে গেলেই সব মাটি। কিন্তু আমিও যে-সে নই। সহজে ছাড়ছি না। যখই হও আর ব্রহ্মদতিই হও, আমিও সহজ পাত্র নই। পুকুরের বাইরে যখন চাঁদটা কিছুতেই আসবে না, আমরা গোটা পুকুরটাই চুরি করে নিয়ে যাব। দেখি তখন পালাও কোথায় ?"

বিস্মিত লখাই জিজ্ঞেস করল, "পুকুর নিয়ে যাবে, সে কী গো ?"

তার বাবা হেসে বলল, "কেন, তুই পুকুর চুরির কথা শুনিসনি ?"

লখাই কোনও দিন পুকুর চুরির কথা শোনেনি। কিন্তু শোনেনি তো কী হয়েছে, আজ সব নিজের চোখে দেখবে। সে ভারী মজা হবে। সে আর তার বাবা গোটা পুকুরটা তুলে নিয়ে চলে যাবে। জলে নামতে হবে না, জলে হাতড়াতে হবে না। চাঁদ, তুমি জলেই থাকো। পুকুরসুদ্ধ তোমাকে নিয়ে যাব। কেমন জব্দ। লখাই ভাবল, ভাগ্যে বাবা এসে পড়েছিল। এত বুদ্ধি তার মাথায় কখনও আসত না।

হঠাৎ লখাইয়ের চোখে পড়ল, চাঁদটা পুকুরের ধার থেকে মাঝামাঝি চলে গিয়েছে। উত্তেজিত হয়ে লখাই তার বাবাকে সে কথা জানাল। তার বাবা হেসে বলল, "মাছ ধরা দেখিসনি ? খেলিয়ে তুলতে হয়। এও তেমনি। চাঁদটাও একটু খেলে নিচ্ছে।"

বলতে বলতে লখাইয়ের বাবা তার ঝোলা থেকে সিঁদকাঠি বার করল দু'রকম, আর একটা বড় ফিতে, এক ডেলা খড়িমাটি, আরও নানা জিনিস।

লখাইয়ের বাবা বলল, "প্রথমে ফিতে দিয়ে পুকুরটার চারপাশ মেপে মেপে খড়িমাটি দিয়ে দাগ কাটতে হবে।"

লখাই জিজ্ঞেস করল, "কেন বাবা, এত ঝামেলার দরকার কী ? আমি তো ভেবেছিলাম আমরা পুকুরটাকে বাড়ি নিয়ে যাব। ভারী মজা হবে, একটা পুকুরও পাব, চাঁদটাও আমাদের হয়ে যাবে।"

তার বাবা মাথা নেড়ে বলল, "দুজন লোক কি একটা পুকুর বয়ে নিয়ে যেতে পারে ? কত জল দেখছিস না ? তার চাইতে সিঁদ কেটে কেটে পুকুরের সব জল বনের বাইরে নিয়ে যাব। সব জল নিয়ে গেলে চাঁদটা আর কোথায় পালাবে ?"

বাবার বুদ্ধি দেখে লখাই মুগ্ধ হয়ে যায়। সত্যি, কার বাবা দেখতে হবে তো !

তার বাবা ফিতের একটা মাথা লখাইয়ের হাতে দিয়ে বলল, "নে, কাজে লেগে পড়। আর কথা নয়।"

দুজন তাদের বিরাট কাজ শুরু করে দিল। সোজা কথা ! এ তো আর মাটির বাড়িতে সিঁদ কাটা নয়। রীতিমত কঠিন কাজ। দু'জনের কারও আর কোনওদিকে খেয়াল নেই। সময় চলে যাচ্ছে। বাবা আর ছেলে নিজেদের কাজ করে যাচ্ছে। কোনও দিকে লক্ষ নেই।

এদিকে চাঁদ তো এক জায়গায় বসে থাকার পাত্র নয়। রাত বাড়ছে, আর আকাশের গায়ে চাঁদ সরে সরে যাচ্ছে। সঙ্গে সঙ্গে চাঁদের ছায়াও সরছে। সরতে সরতে তা এক সময় পুকুর ছাড়িয়ে চলে গেল। লখাইয়েরই প্রথমে চোখে পড়ল, চাঁদটা নেই। সে চিৎকার করে কেঁদে উঠল, "বাবা, আমি তখনই বলেছিলাম, এখানে জাদু আছে। দ্যাখো, চাঁদ উবে গেছে। এত কষ্ট করলাম। হায়, হায়।"

তার বাবা পুকুরের পাড় ধরে ছোটাছুটি করতে লাগল। তাই তো, কোথায় গেল ? এই ছিল এই নেই—এ কি ভোজবাজি নাকি !

ওদিকে গাছের নীচে দাঁড়িয়ে আর-একটা চোর অনেকক্ষণ ধরে লক্ষ করছে, দু'জন পুকুরপাড়ে সিঁদ কাটছে। ব্যাপারটা কী জানতে হয়। নিশ্চয় বড় কিছুর খোঁজ পাওয়া গিয়েছে।

এখন এদের ছোটাছুটি হাঁকডাক করতে দেখে সে এগিয়ে এল। তাকে দেখে লখাই গরগর করে বলতে লাগল, সে আর তার বাবা চাঁদটা চুরি করতে চেয়েছিল, কিন্তু...

আর কিন্তু। চাঁদ চুরি পর্যন্ত শুনেই চোরমশাই ছুটতে ছুটতে পণ্ডিতমশাইকে সব বলল। পণ্ডিতমশাই বলল কোটালকে। পাইক ছুটে এসে লখাই আর তার বাবাকে পাকড়াও করে নিয়ে গেল। দুটো লোক চাঁদ চুরি করেছে শুনে শহরের সমস্ত লোক ভারী উত্তেজিত হয়ে উঠল। লখাই আর তার বাবাকে নিয়ে বানানো সব গল্প মুখে-মুখে ছড়িয়ে পড়তে লাগল। যেমন লখাইয়ের নাকি দু'হাতে ছ'টা ছ'টা বারোটা আঙুল। লখাইয়ের বাবা রোজ রাতে জোনাকির রস গায়ে মাখে। চাঁদ চুরির ফন্দিটা নাকি ওদের মাথায় এসেছে বছর খানেক আগে। পণ্ডিত বলে বেড়াচ্ছে, সে না থাকলে চোর ধরা পড়ত না। তিন দিন আগে মন্দিরে তার হাত থেকে ফুলের মালা মাটিতে

পড়ে যেতেই তার আশঙ্কা হয়েছিল, শহরের লোকের কোনও অমঙ্গল হবে। দিন-রাত সে পুজো-পাঠ করেছে তাই চোর ধরা পড়ল। কোটাল বলছে, লখাইয়ের বাপকে দেখে অনেক দিন আগেই তার সন্দেহ হয়েছিল। তাই সে তার ওপর নজর রেখেছিল। আর সেজন্যই চোর হাতেনাতে ধরা পড়ল।

আর আসলে যে খবর দিয়েছিল সে কিছু বলার সুযোগই পাচ্ছে না। সুযোগ পেয়ে বললেও অবশ্য কেউ বিশ্বাস করত না, সামান্য একটা চোর এত বড় কাজ করেছে! আর দু'চারজন বিশ্বাস করলেও হয়তো ভাবত, এ ব্যাটাও ওদের সঙ্গে ছিল। বখরা নিয়ে গোলমাল হওয়ায় এখন সাধু সেজেছে।

চাঁদ-চোরদের বিচারের সময় শহরের লোক ভেঙে পড়ল। এরকম বড় ধরনের চুরির কথা কেউ কোনওদিন শোনেওনি। সবাই তাই এরকম সাঙ্ঘাতিক চোরদের দেখতে এসেছে।

বিচার শুরু হল। কোটাল উঠে নিজের কৃতিত্ব জাহির করতে লাগল। তারপর উঠল পণ্ডিত। সেও নিজের প্রশংসা নিজেই করতে লাগল। তখন কোটাল আবার উঠে দাঁড়িয়ে বলল, "পণ্ডিত আজেবাজে বকছে।"

পণ্ডিত বলল, "তুমি বাজে বকছ।"

ব্যস, দুজনের ঝগড়া লেগে গেল। সবাই হাততালি দিয়ে বলতে লাগল, লাগ লাগ লাগ।

ভিড়ের মধ্যে, গোলমালের মধ্যে লখাই আর তার বাবা মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে আছে। তাদের মনে ভারী দুঃখ। একেই তো চাঁদটা হাতছাড়া হয়ে গেছে, তার ওপর এখন বিচারে কী শাস্তি হবে কে জানে?

এই সময় বিচারকের গলা শোনা গেল, "সবাই চুপ—চোপ। এখানে বিচার হচ্ছে, না কিতকিত খেলা হচ্ছে?"

পাঠশালার ছেলের মতো শ্রোতাদের দু'তিনজন হাত তুলে বলতে লাগল, "আমি বলব, আমি বলব?" একজন উঠে দাঁড়িয়ে বলতে লাগল, "এটা কিতকিত খেলা নয়। কারণ, এক নম্বর···"

বিচারপতি আবার ধমকে উঠল, "চোপ, তোমাকে জিজ্ঞেস করা হয়নি। বোসো। আচ্ছা, পণ্ডিতকে আর কোটালকে জিজ্ঞেস করছি, তোমাদের হাতে কোনও প্রমাণ আছে?"

দুজনেই একসঙ্গে জিজ্ঞেস করল, "প্রমাণ? কিসের প্রমাণ?"

"লখাই আর তার বাবাই যে চাঁদ চুরি করেছে, তার প্রমাণ?"

পণ্ডিত বলল, "প্রমাণ আবার কী? ওরা চুরি না করলে কে চুরি করল, বলুন, আপনি করেছেন?"

ভারী ঘাবড়ে গিয়ে বিচারক বলল, "আমি করতে যাব কেন? বলুন তো কোটালমশাই, বলুন তো আপনারা?"

পণ্ডিত গম্ভীর গলায় বলল, "প্রমাণ-ট্রমান লাগবে না। আমি বলছি এই যথেষ্ট। আপনি কি বলতে চান আমি মিথ্যেবাদী? আমি মিথ্যে কথা বলছি? জানেন আমার কত শিষ্য আছে? আমার টোলে তো আপনার ছেলেও পড়ে। আমাকে অপমান করলে কাল থেকে তার নাম কেটে দেব।"

বিচারক বলল, "আহা, এত রাগারাগি করলে কি বিচার-টিচার করা যায়? আপনি এত বড় পণ্ডিত, আপনি নিশ্চয় জানেন, একটা প্রমাণ না পেলে ভারী মুশকিলে পড়তে হয়। ঠিক আছে, আপনি যখন বলছেন, এদের শাস্তি না হয় দিয়ে দেওয়া যাবে। কিন্তু একটা প্রমাণ খুঁজে বার করতে হবে তো? কী কোটালমশাই, আপনি চুপ করে আছেন কেন?"

কোটাল বলল, "দেখুন, আপনি ঠিকই বলেছেন। কিন্তু হয়েছে কী, চোর ধরতে আমি এতই ব্যস্ত ছিলাম যে, প্রমাণ খোঁজার সময় পাইনি।"

বিচারক বলল, "তা হলে উপায়?"

কোটাল বলল, "উপায়?"

পণ্ডিত বলল, "তা হলে?"

অনেক ভেবে, অনেক মাথা চুলকে আর দাড়িতে হাত বুলিয়ে বিচারক বলল, "চোর তো ধরাই পড়েছে, কোনও চিন্তা নেই। কোটালমশাই আর পণ্ডিতমশাই এখন প্রমাণ—যা হোক একটা কিছু প্রমাণ খুঁজে বার করুন। ত্রিশ দিন সময় দেওয়া হল। এই ত্রিশ দিন লখাই আর তার বাবাকে আটকে রাখা হবে।"

বিচারকের কথায় পণ্ডিতমশাই খুশি হয়নি। সে গজগজ করতে করতে বাড়ি চলে গেল। কোটাল মনে মনে বলল, এত দিন দরকার ছিল না। বাছাধনদের এমন ধোলাই দেব যে, বাপ-বেটা এক দিনেই স্বীকার করবে, ওরা চাঁদ চুরি করেছে। যাকগে, এখন আর কী করা যাবে। যে-কোনও একটা প্রমাণ খাড়া করতেই হবে।

ত্রিশ দিন পর আবার বিচারসভা বসল। সবাই হাজির হয়েছে। আসেনি শুধু পণ্ডিত। সে কোন্ যজমানের বাড়ি গিয়েছে। এখান থেকে বিশ ক্রোশ দূরের পথ। এখনও সে ফেরেনি। কিন্তু তাকে বাদ দিয়ে বিচার হতে পারে না। বিচারকমশাই নিয়ম-কানুন মেনে চলতে বড় ভালবাসেন। সকাল গড়িয়ে দুপুর হল, দুপুর গড়িয়ে বিকেল। পণ্ডিতের দেখা নেই। অনেকে বলাবলি করছে, পণ্ডিত মোটেই যজমানবাড়ি যায়নি। প্রমাণ খুঁজতে কোথাও গেছে। না নিয়ে ফিরবে না। কেউ বলছে, পণ্ডিত কোথাও যায়নি। নিজের ঘরের দরজা বন্ধ করে বসে আছে।

এদিকে লখাই আর তার বাবা সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারছে না। কোটাল তাদের এত পিটিয়েছে যে, হাড়গোড় ভেঙে গেছে। হাত-পা বাঁধা অবস্থায় তারা মাঝে-মাঝে পড়ে যাচ্ছে। লখাই ভয়ে কাঁদতেও পারছে না। ফ্যালফ্যাল করে তাকাচ্ছে। তার বাবা ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে। এমন সময় পণ্ডিত এসে হাজির। সবাই নড়েচড়ে বসল। সভার কাজ শুরু হল। অন্ধকার হয়ে গেছে। কয়েকটা মশাল জ্বালিয়ে দেওয়া হয়েছে। মশালের আলো কাঁপছে, সেই সঙ্গে সভার লোকদের মুখগুলোও যেন কাঁপছে থরথর করে।

বিচারক জিজ্ঞেস করল, "বলুন পণ্ডিতমশাই, কী প্রমাণ আপনি এনেছেন?"

পণ্ডিত বলল, "সভায় বলার আগে আপনার কানে-কানে কিছু বলতে চাই।"

সভার সবাই ফিসফিস করে নানা কথা বলতে লাগল। পণ্ডিত উঠে গিয়ে বিচারকের কানে কানে বলল, "রাজামশাইয়ের প্রধান পণ্ডিতের সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলাম।"

রাজার পণ্ডিতের কথা শুনেই বিচারক সোজা হয়ে বসল।

পণ্ডিত বলতে লাগল, "তাঁকে সব বলেছি। তিনি বলেছেন, আমার কথা বিশ্বাস না করলে রাজ্যের সমস্ত পণ্ডিত খেপে উঠবেন। প্রধান পণ্ডিত রাজার কাছে নালিশ করবেন। পণ্ডিতদের কাজ পুজোপাঠ, ধর্মকে বাঁচানো। ধর্মে হস্তক্ষেপ করা চলবে না।"

পণ্ডিত নিজের জায়গায় গিয়ে বসে পড়ল। বিচারকের মাথা ঘুরছে। এক দিকে নিয়ম, অন্য দিকে পণ্ডিতের শাসানি। কী করা যায়? এই সময় কোটাল উঠে বলল, "শুনুন বিচারকমশাই, লখাই আর তার বাবা চাঁদটা যে চুরি করেছে, আমি এখনই প্রমাণ করে দিচ্ছি। এক নম্বর প্রমাণ, লখাই আর তার বাবা যখন পুকুরপাড়ে যায়, পুকুরে তখন চাঁদটা ছিল। তখন সেখানে আর কেউ ছিল না। তারপর দেখা গেল, পুকুরটা পুকুরের জায়গাতেই আছে। লখাই আর তার বাপও আছে, কিন্তু চাঁদটা নেই। অতএব প্রমাণ হল, ওরাই চাঁদটা সরিয়েছে। দু' নম্বর, লখাই আর তার বাবাকে জিজ্ঞেস করুন, ওরাও স্বীকার করবে।"

আসামিদের দিকে তাকিয়ে কোটাল জিজ্ঞেস করল, "কী, তোরা চুরি করেছিস, না করিসনি?"

লখাইয়ের বাবা কাঁদতে কাঁদতে বলল, "করেছি, করেছি…"

ঠিক এই সময় একজন ছুটতে ছুটতে এসে বলল, "ওরা চুরি করেনি। চাঁদ মোটেই চুরি হয়নি।"

বিচারক রেগে বলল, "চুরি হয়নি মানে? চালাকি নাকি? একবার যখন প্রমাণ হয়ে গেছে ওরা চুরি করেছে, তখন আলবত চুরি হয়েছে। এখন হয়নি বললে হবে না।"

যে ছুটে এসেছিল, সে আর কেউ নয়, সেই চোর, যে প্রথমে চাঁদ চুরির খবর দিয়েছিল। সে এখন বলল, "কী করে প্রমাণ পেলেন, আমি নিজের চোখে দেখেছি…"

বিচারক আরও রেগে বলল, "কী করে প্রমাণ হল? তোর তো সাহস কম নয়! কে রে ব্যাটা তুই? জানিস, কোটালমশাই এই মাত্র প্রমাণ করেছেন আর পণ্ডিতমশাইও সে-কথাই বলেছেন। ব্যস, প্রমাণ হয়ে গেল ওরাই চুরি করেছে। এত বড় আস্পদ্দা তোর, বলতে চাস এঁরা মিথ্যে বলেছেন? এই, কে আছিস, ধর তো ওকে।"

পণ্ডিত চোরকে চিনতে পেরে বলল, "আরে থামুন, শুনুন না আগে ও কী বলছে?"

চোর বলল, সে জানত ওই পুকুরপাড়ে লখাইয়ের বাবা চুরি করা জিনিস লুকিয়ে রাখে। লখাই আর তার বাবা ধরা পড়েছে। এই সুযোগে সে আজ গিয়েছিল সেই লুকনো জিনিস খুঁজে বার করতে। গিয়ে দেখে, পুকুরের জলের মধ্যে এত বড় চাঁদ ভাসছে।

পণ্ডিত বলল, "আমার তখনই সন্দেহ হয়েছিল। সেজন্যই তো আজ দেরি করে এসেছি।"

কোটাল বলল, "আগের দিনই আপনাকে বলেছি, বলিনি প্রমাণ খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না?"

তখন বিচারক, পণ্ডিত, কোটাল, আরও অনেকে গেল সেই পুকুরপাড়ে। হয়েছে কী, চাঁদ-চুরি হয়েছিল পূর্ণিমায়। আবার সেই পূর্ণিমা ফিরে এসেছে। সবাই দেখল, পুকুরের শান্ত জলে চমৎকার চাঁদ। সত্যি তা হলে লখাই আর তার বাবা চুরি করেনি?

বিচারক বলল, "তা হলে উপায়? পণ্ডিতমশাই?"

পণ্ডিত বলল, "তখনই বলেছিলাম, যত দোষ ওই ব্যাটা চোরের, যে প্রথম খবর দিয়েছিল। এক মুখে দু'রকম কথা। সেদিন বলল, চুরি হয়েছে, আজ বলছে চুরি হয়নি। ওকে ধরে শাস্তি দিন।"

কোটাল বলল, "ঠিক।"

বিচারক বলল, "ঠিক, ঠিক।"

সবাই বলতে লাগল, ঠিক, ঠিক, ঠিক।

যে যার বাড়ি ফিরে গেল। চোরকে পাকড়াও করে নিয়ে গেল কোটাল। লখাই আর তার বাবা খোঁড়াতে খোঁড়াতে বাড়ির দিকে চলল। যেতে-যেতে লখাই বলল, "চাঁদটা ভারী বোকা। এখনও বুদ্ধি করে লুকিয়ে থাকলে আমরা ছাড়া পেতাম না। তাই না বাবা?"

ছবি : দেবাশিস দেব

নতুন ভোর হল নতুন রোদ উঠল

নতুন সানলাইট
ডিটারজেন্ট পাউডার

আপনার কাপড়ে এনে দেয় রোদের চমক

আপনিও আপনার ঘরে সানলাইটের ঝলমলানি আনুন। নতুন সানলাইট ডিটারজেন্ট পাউডার ওজনে খুব হাল্কা, কিন্তু কাজ দেয় বেশি। দামী পাউডারের মত কাজ দেয়, অথচ দাম কম।

সানলাইটে একটি এমন উপাদান আছে, যা সাধারণ পাউডারে নেই। এটি কাপড়ের প্রতিটি তন্তু থেকে ময়লা বের করে দিয়ে তাতে চমক নিয়ে আসে।

সানলাইটে না হয় হাতের কষ্ট, না হয় কাপড়ের ক্ষতি। আর এর তাজা মনোরম সুগন্ধ আপনার কাপড়ের মধ্যেও ছড়িয়ে পড়বে।

আপনিও আপনার জীবনে নিয়ে আসুন সানলাইটের চমক। একবার ব্যবহার করে দেখুন—মাত্র ৬ টাকা ৩৫ পয়সায়।

মাত্র
টা.৬·৩৫
(স্থানীয় কর অতিরিক্ত)

আপনার কাপড়ে এনে দেয় রোদের চমক

হিন্দুস্থান লিভারের একটি উৎকৃষ্ট উৎপাদন

OBM/2668 BEN

কালো পর্দার ওদিকে

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

আগে যা ঘটেছে : দিপু আর তার দিদি ইরানি এসেছে বর্ধমানের একটি গ্রামে। ওদের জ্যাঠামশাই চাকরি থেকে রিটায়ার করে সেই গ্রামে অনেক রকম বাগান করেছিলেন। কিন্তু কয়েকদিন ধরে তাঁকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। রাত্তিরবেলা তিনি একা-একা লেবুবাগানে গিয়েছিলেন, তারপর থেকেই তিনি উধাও। দিপু তার দিদিকে কিছু না জানিয়ে মাঝরাতে বাইরে এসে পুকুরধারে একজন রহস্যময় লোকের দেখা পেল। তারপর সেও আর ফিরে এল না। পরদিন সকালে ইরানি তার ভাইকে খুঁজে না পেয়ে গেল থানায় খবর দিতে। থানার বড়বাবু তাকে নিয়ে এলেন শ্মশানে এক সাধুবাবার কাছে। এদিকে কলকাতায় দিপুর বাবা ওদের খবর না পেয়ে ছটফট করছিলেন। শেষপর্যন্ত তিনিও তাঁর এক ডাক্তারবন্ধু আর একজন পুলিস অফিসারকে সঙ্গে নিয়ে বেরিয়ে পড়লেন, খুঁজতে-খুঁজতে চলে এলেন সেই শ্মশানে। তারপর···

পরিতোষ ডাক্তার ঠোঁটে আঙুল দিয়ে সবাইকে চুপ করতে বলে হাঁটু মুড়ে বসলেন ইরানির পাশে। বাবা কিন্তু নিজেকে সামলাতে পারলেন না। তিনি উত্তেজিত ভাবে বললেন, "কী হয়েছে ওর ? ইরানি, ইরানি !"

সঙ্গে সঙ্গে ইরানির বিড়বিড় করা থেমে গেল, হাসিটাও মিলিয়ে গেল মুখ থেকে। জোরে জোরে নিশ্বাস ফেলল কয়েকবার। তারপর চোখ মেলে তাকাল।

পরিতোষ ডাক্তার ইরানির একটা হাত তুলে নিয়ে নাড়ি দেখলেন। জিজ্ঞেস করলেন, "কী হয়েছিল রে, তোর ? অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিলি ? ইশ, জামা যে একেবারে জল-কাদায় মাখামাখি !"

ইরানি চোখ ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে সবাইকে দেখল। সাধুবাবার মুখের দিকে দৃষ্টি স্থির রেখে সে বলল, "আমি দিপুকে দেখতে পেয়েছি। সে হারিয়ে যায়নি !"

সাধুবাবা বললেন, "তোমার সত্যি খুব মনের জোর আছে, মা। তোমার মতন মেয়ে আমি আগে দেখিনি !"

ইরানি বলল, "জ্যাঠামণিকেও দেখতে পেয়েছি। দিপু আর জ্যাঠামণি এক জায়গাতেই আছেন।"

বাবা বললেন, "দিপু ? কোথায় দেখতে পেলি তাকে ?"

ইরানি আস্তে-আস্তে উঠে বসে বলল, "খুব কাছ থেকে দেখতে পেলুম, আমার সঙ্গে কথা বলছিল। এমন সব অদ্ভুত অদ্ভুত কথা···"

হঠাৎ থেমে গিয়ে অবাক ভাবে চোখ বড়-বড় করে সে বলল, "বাবা ? তুমি কখন এলে ? কী করে এলে এখানে ? ওমা, ডাক্তার-কাকামণিও রয়েছেন। তাহলে এ জায়গাটা কোথায় ?"

পরিতোষ ডাক্তার বললেন, "ঠিক আছে, আস্তে আস্তে সব শোনা যাবে। তুই সুস্থ বোধ করছিস তো ? শরীর ঠিক আছে ?"

ইরানি বলল, "আমার ঘুম পাচ্ছে খুব। আমার জামা ভিজে গেল কী করে ? ও, মনে পড়েছে। আমি তো বৃষ্টির মধ্যে দাঁড়িয়ে দিপুকে ডাকছিলুম।"

"দিপুর কী হয়েছিল ?"

"কাল রাত্তির থেকে দিপু যে হারিয়ে গিয়েছিল। জ্যাঠামণির মতন। তারপর সাধুবাবা বললেন, 'তুমি বৃষ্টির মধ্যে দাঁড়িয়ে একমনে দিপুর কথা চিন্তা করো আর ডাকো, তাকে দেখতে পাবে।' সত্যি সত্যি তাই হল !"

"কোথায় দেখতে পেলি দিপুকে ?"

"একটা আমবাগানে।"

রমেন সরকার আর দারোগাবাবু দরজার সামনে দাঁড়িয়ে ফিসফিস করে কথা বলছিলেন। এবারে দারোগাবাবু জোরে-জোরে বললেন, "স্যার, আমার মনে হচ্ছে এই সাধুবাবা একজন তান্ত্রিক। মেয়েটাকে হিপনোটাইজ করেছে। আমি স্যার, আগেই এই সাধুবাবাকে অ্যারেস্ট করে নিয়ে যেতে চেয়েছিলুম, হঠাৎ খুব ঝড়বৃষ্টি এসে গেল। এখানে স্যার ঝড়বৃষ্টিও খুব অদ্ভুত !"

রমেন সরকার বললেন, "দাঁড়ান, আগে দেখা যাক মেয়েটি সুস্থ আছে কি না। ওর যদি চিকিৎসার দরকার হয়···"

পরিতোষ ডাক্তার বললেন, "না, তার দরকার নেই। এমনিতে তো ঠিকই আছে।"

রমেন সরকার বললেন, "তাহলে এখানে সময় নষ্ট করে কোনও লাভ নেই। রামবাবুর বাগানে গিয়েই বসা যাক। সাধুবাবা, আপনিও চলুন।"

সাধুবাবা বললেন, "আগে ওই মেয়েটির সব কথা শুনে নিন। সেটাই খুব দরকারি। একটু পরে ও সব কথা ভুলে যাবে।"

ইরানি আচ্ছন্ন ভাবে জিজ্ঞেস করল, "আমি কি স্বপ্ন দেখছিলুম এতক্ষণ ?"

সাধুবাবা বললেন, "না, মা, তুমি স্বপ্ন দেখোনি, যা দেখেছ, সব সত্যি। এবারে বলো তো, কী কী দেখলে ?"

ইরানি বলল, "দিপুকে দেখলুম, একটা আমবাগানে শুয়ে আছে। আমি জিজ্ঞেস করলুম, 'এই দিপু, তুই আমাকে কিছু না বলে কোথায় গিয়েছিলি ? তুই এখানে শুয়ে আছিস কেন ?' দিপু বলল, 'এটা খুব মজার জায়গা রে দিদি। এখানে শুয়ে থেকেও অনেক জায়গায় ঘুরে বেড়ানো যায়। এর মধ্যে কত জায়গায় যে গেলুম !' দিপুটা তো খুব বানিয়ে বানিয়ে অদ্ভুত কথা বলে, তাই আমার বিশ্বাস হল না। আমি বললুম, 'ফের তুই গুল ঝাড়ছিস, দিপু ? এক জায়গায় শুয়ে শুয়ে কি অনেক জায়গায় ঘুরে বেড়ানো যায় ? তুই কোথায় কোথায় ঘুরেছিস ?' দিপু বলল, 'সে কত জায়গা ! এই তো এইমাত্র দেখলুম, তুই নদীর ধারে এক সাধুবাবার আশ্রমের সামনে বৃষ্টিতে ভিজছিস। আমি তোর পাশে দাঁড়ালুম !' আমি জিজ্ঞেস করলুম, 'আমি যে সাধুবাবার কাছে এসেছি, তা তুই জানলি কী করে ?' দিপু বলল, 'সে একটা বেশ মজার উপায় আছে ! জানিস দিদি, আমি জ্যাঠামশাইকে খুঁজে পেয়েছি।

আপনার বাচ্চার নরম ত্বকের জন্যে প্রয়োজন,
জনসন্স বেবী পাউডার-এর মমতাভরা পরশের। জনসন্স
বেবী পাউডার জ্বালা থামিয়ে আরাম দেয়, আর
ন্যাপকিন থেকে র‍্যাশ হওয়া নিবারণ করে… আর,
আপনার বাচ্চাকে রাখে স্নিগ্ধ-শীতল ও আরামের মধ্যে।
এর পরশও আপনার স্নেহের পরশের মতই… কাছে না
থাকলেও বাচ্চা মনে করবে, আপনি কাছেই আছেন!
Johnson's
baby
powder
PUREST PROTECTION
Johnson & Johnson
কোমল…যেন মমতার পরশ: জনসন্স বেবী পাউডার
LINTAS J & J 22 2719 BG

তুই দেখবি জ্যাঠামশাইকে ? ওই দ্যাখ আমি দেখলুম, জ্যাঠামশাইও শুয়ে আছেন এক জায়গায়...তারপর আর মনে নেই !"

কথা থামিয়ে ইরানি বলল, "চলো, আমরাও সেই আমবাগানে যাই !"

রমেন সরকার জিজ্ঞেস করলেন, "কোথায় সেই আমবাগান ?"

ইরানি বলল, "তা তো জানি না।"

রমেন সরকার সাধুবাবার দিকে তাকিয়ে বললেন, "এসব কী ? আপনি সত্যি মেয়েটাকে হিপনোটাইজ করেছিলেন ?"

সাধুবাবা বললেন, "সে শক্তি আমার নেই। এ মেয়েটির অসাধারণ মনের জোর, তাতেই সে দূরের জিনিস দেখতে পেয়েছে।"

রমেন সরকার বললেন, "আমি এ-কথার মানে বুঝতে পারছি না।"

খয়েরলাল এগিয়ে এসে বলল, "স্যার, এই সাধুবাবা যে-সে লোক নন ! এনার অলৌকিক ক্ষমতা আছে। ইনি আমাকে দেখে ঠিক চিনে ফেলেছেন।"

"কী চিনে ফেলেছেন ?"

"মানে, ইয়ে, আমার গায়ে তো পুলিশের পোশাক নেই, তবু ইনি ঠিক বলে দিলেন যে আমি পুলিশে কাজ করি !"

সাধুবাবা বললেন, "না, আমি সে-কথা বলিনি। আমি বলেছিলুম, তুমি আগে ট্রেনে ডাকাতি করতে, এখন ভাল হয়ে গেছ !"

সাধুবাবা রমেন সরকারের দিকে ফিরে বললেন, "আপনি তো পুলিশের একজন বড় কেউ, তাই না ? শুনুন, এখানে যে ব্যাপারটা ঘটছে কয়েকদিন ধরে, তার সঙ্গে পুলিশের কোনও সম্পর্ক নেই। এখানে কেউ কারুর কোনও ক্ষতি করছে না।"

রমেন সরকার বললেন, "কেউ কোনও ক্ষতি করছে না মানে ? রামবাবু হঠাৎ একদিন উধাও হয়ে গেলেন। তাঁর পেয়ারাবাগান কেউ পুড়িয়ে দিল। তারপর দিপু নামে ছেলেটি, তাকেও খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না।"

সাধুবাবা বললেন, "পেয়ারাগাছটি পুড়ে গেছে বাজ পড়ে। আর রামবাবু কিংবা এই মেয়েটির ভাই, তাদের কেউ জোর করে ধরে নিয়ে যায়নি, তারা নিজের ইচ্ছেতে গেছে।"

"কোথায় ?"

"তা আমি ঠিক জানতুম না। জানলে তো আগেই বলে দিতুম। একটু-একটু আন্দাজ করেছিলুম শুধু। এই মেয়েটির কথা শুনে আমি সব বুঝতে পারলুম।"

"কিন্তু আমরা তো এখনও কিছুই বুঝতে পারছি না।"

"সব আপনাদের বুঝিয়ে বলা যাবে না। অত সময় নেই। সংক্ষেপে বলছি শুনুন। আমার এক গুরুভাই ছিল, তার নাম ডমরুপাণি নন্দী। সে অদৃশ্য হয়ে গেছে।"

"তার মানে ? কোথাও চলে গেছে ?"

"না, আমি যা বলছি তাই। সে অদৃশ্য হয়ে গেছে। আমাদের চেনাশুনো জগতের বাইরে একটা জগৎ আছে। সেখানে কেউ-কেউ অদৃশ্য হয়ে যায়। ঠিক যেন একটা পদার আড়ালে লুকিয়ে পড়ার মতন। ডমরু শখ করে সেই অদৃশ্য জগতে গেছে। কিন্তু আর ফিরে আসতে পারছে না। মাঝে-মাঝে সে আমার কাছে আসবার চেষ্টা করে। সে ভাবে, আমি বুঝি তাকে ফিরিয়ে আনার ব্যাপারে সাহায্য করতে পারব। কিন্তু মুশকিল হচ্ছে, সে এখানে আসবার চেষ্টা করলেই প্রকৃতির মধ্যে সাংঘাতিক একটা ওলট-পালট হয়ে যায়। ঝড়বৃষ্টি নামে, বাজ পড়ে !"

পরিতোষ ডাক্তার বাধা দিয়ে বলে উঠলেন, "শুনুন মশাই, আপনাকে আমি অসম্মান করছি না। কিন্তু আমি শুনেছি, সাধু-সন্ন্যাসীরা সব সময় গাঁজায় দম দিয়ে থাকেন। আপনিও কি নেশার ঝোঁকে আছেন ? এসব কী বলছেন, মাথামুণ্ডু কিছুই বুঝতে পারছি না। কোনও মানুষ আবার অদৃশ্য হতে পারে নাকি ?"

সাধুবাবা বললেন, "আপনারা অবিশ্বাস করলে আমার আর কিছু বলার নেই।"

বাবা বললেন, "না, না, আপনি সবটা বলুন। পরিতোষ, ওঁকে সব খুলে বলতে দাও !"

রমেন সরকার বললেন, "সাধুবাবা, আপনি আগে বলুন, আপনার এই গল্পের সঙ্গে রামবাবু আর দিপুর নিখোঁজ হয়ে যাবার কী সম্পর্ক !"

সাধুবাবা বললেন, "ওই যে আমার গুরুভাইয়ের কথা বললাম, সে তো সর্বক্ষণ চেষ্টা করছে ফিরে আসতে। তার কোনও উপায় খুঁজে পাচ্ছে না বলে সে মাঝে-মাঝে কোনও-কোনও মানুষের স্বপ্নের মধ্যে ঢুকে পড়ে।"

"বুঝলুম না। আমি স্বপ্ন দেখছি, তার মধ্যে কেউ ঢুকে পড়বে কী করে ?"

"মনে করুন, আপনি স্বপ্ন দেখছেন যে, আপনি একা-একা কোনও জায়গা দিয়ে হেঁটে যাচ্ছেন। তার মধ্যেই দেখলেন, একটু দূরে একজন অচেনা লোক দাঁড়িয়ে আছে। সে আপনাকে হাতছানি দিয়ে ডাকল। আপনি তার কাছে গেলেন। তার সঙ্গে কথা বলে আপনার ভাল লাগল। তারপর আপনি তার সঙ্গেই রইলেন। এই রকম ব্যাপার আর কি !"

"অর্থাৎ আপনি বলতে চাইছেন, দিপু আর তার জ্যাঠামশাই আপনার ওই অদৃশ্য গুরুভাইয়ের কাছেই রয়েছে। ওরা দু'জনও কি অদৃশ্য হয়ে গেছে ?"

"সবাই কি আর অদৃশ্য হতে পারে ? হতে তো অনেকেই চায় মাঝে-মাঝে। আপনি চান না ? ফিরে আসবার উপায় জানলে সবাই চাইত। না, দিপু আর তার জ্যাঠা অদৃশ্য হয়নি। ঘুমের ঘোরে মানুষ হেঁটে-হেঁটে অনেক দূরে চলে যায় কখনও কখনও। ওরা দু'জনেই সেইভাবেই গেছে !"

হঠাৎ ইরানি উঠে দাঁড়িয়ে বলল, "আমি ওই আমবাগানে যাব। দিপু আমায় ডাকছে !"

বলতে-বলতেই ইরানি ঘর থেকে বেরিয়ে একটা দৌড় লাগাল। বাকি সবাই ছুটল তার পেছন-পেছন।

(আগামী সংখ্যায় সমাপ্য)

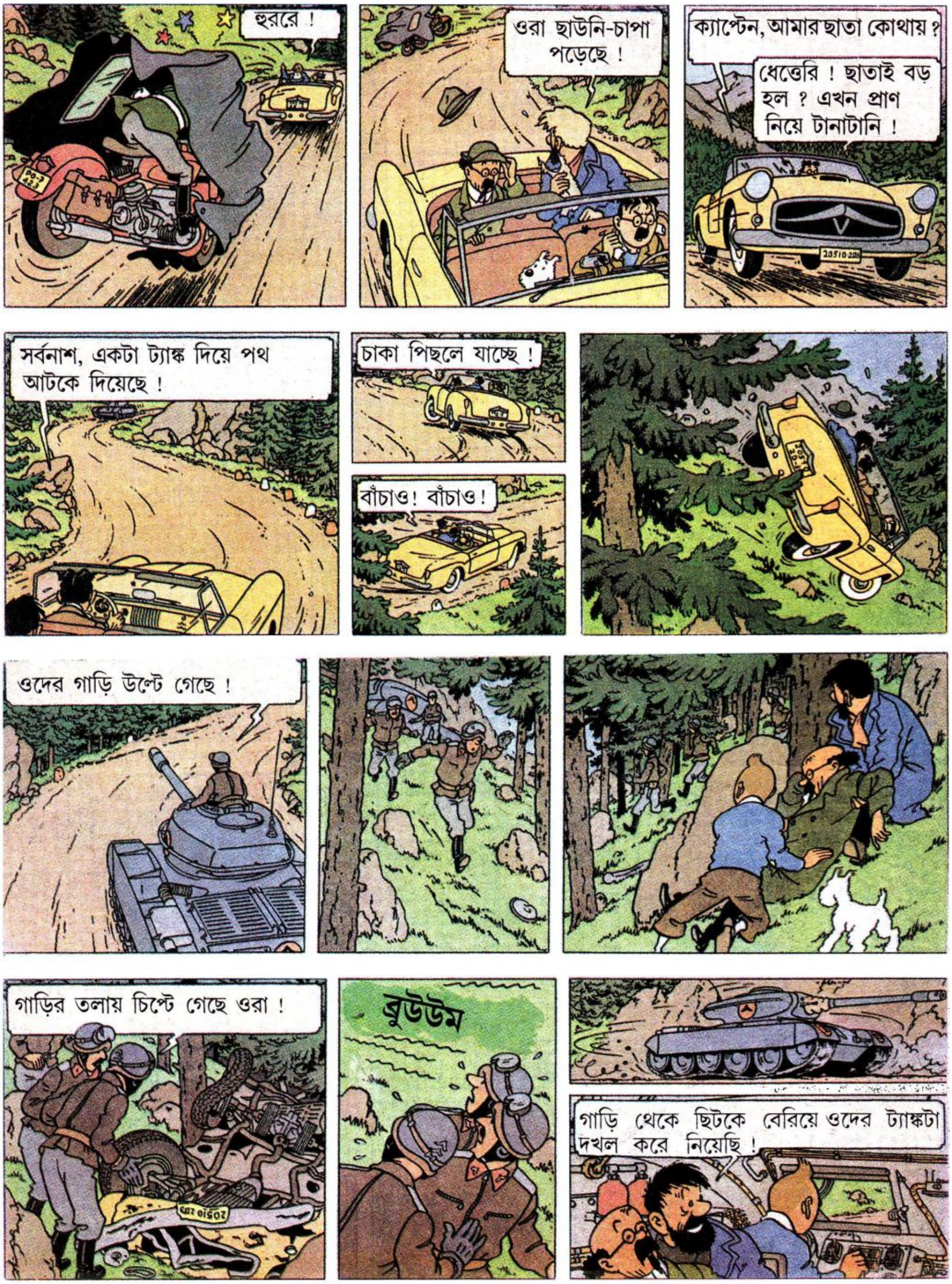
হুররে !
ওরা ছাউনি-চাপা পড়েছে !
ক্যাপ্টেন, আমার ছাতা কোথায় ?
ধেত্তেরি ! ছাতাই বড় হল ? এখন প্রাণ নিয়ে টানাটানি !
সর্বনাশ, একটা ট্যাঙ্ক দিয়ে পথ আটকে দিয়েছে !
চাকা পিছলে যাচ্ছে !
বাঁচাও! বাঁচাও!
ওদের গাড়ি উল্টে গেছে !
গাড়ির তলায় চিপ্টে গেছে ওরা !
ব্রুউউম
গাড়ি থেকে ছিটকে বেরিয়ে ওদের ট্যাঙ্কটা দখল করে নিয়েছি !

ক্যালকুলাসের কাণ্ড

(এর পরে আগামী সংখ্যায়)

মালদহ বার্লো বালিকা বিদ্যালয়ের প্রধানা শিক্ষিকা কী বলেন

একশো চোদ্দ বছর আগে মাত্র বিয়াল্লিশজন ছাত্রী নিয়ে মালদহে বার্লো বালিকা বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা হয়েছিল। এখন এই পুরনো ও বিখ্যাত স্কুলটিতে কয়েকশো ছাত্রী পড়াশোনা করে। উত্তরবঙ্গে স্কুলটির বিস্তর নামডাক। ১৮৭১ সালে জেলার কয়েকজন উৎসাহী শিক্ষানুরাগী মানুষ এই স্কুলটি প্রতিষ্ঠা করে মালদহে স্ত্রী-শিক্ষার সূচনা করেন। এই ব্যাপারটাকে জেলার রক্ষণশীল হিন্দু-মুসলমান সম্প্রদায় ভাল চোখে দেখেননি। তাঁরা নানাভাবে এই সাধু প্রচেষ্টার বিরোধিতা করেছিলেন। কাশিমবাজারের মহারাজা দানবীর মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী এককালীন ৫০০ টাকা সাহায্য করেন। বস্তুত তাঁরই উৎসাহ এবং অর্থানুকুল্যে বার্লো বালিকা বিদ্যালয়ের (তখন নাম ছিল : মালদহ গার্লস' স্কুল) প্রতিষ্ঠা সম্ভব হয়।

১৮৮৭ সালে ভাগলপুর ডিভিশনের কমিশনার জি· এস· বার্লোর নামে এই স্কুলটির নাম রাখা হয় বার্লো বালিকা বিদ্যালয়। মালদহ তখন বিহারের ভাগলপুর ডিভিশনের অন্তর্ভুক্ত ছিল।

মালদহ জেলার এই স্কুলের মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার ফলাফল বেশ সন্তোষজনক। ১৯৮২ সালে মাধ্যমিক পরীক্ষা দিয়েছিল ৭৯ জন ছাত্রী। প্রথম বিভাগ ১৪, দ্বিতীয় বিভাগ ৩৮, তৃতীয় বিভাগ ২১। বন্দিতা চন্দ্র জেলার ছাত্রীদের মধ্যে প্রথম স্থান অধিকার করে। ১৯৮৩ সালে মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ছিল ৮৭। প্রথম বিভাগ ১৭, দ্বিতীয় বিভাগ ৪৮, তৃতীয় বিভাগ ৭। চৈতালি রায় জেলার ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে প্রথম স্থান এবং উত্তরবঙ্গের ছাত্রীদের মধ্যে দ্বিতীয় স্থান লাভ করে। ১৯৮৪ সালে পরীক্ষা দিয়েছিল ৯১ জন ছাত্রী। প্রথম বিভাগে পাশ করেছিল ১৩ জন, দ্বিতীয় বিভাগে ৫৫, তৃতীয় বিভাগে ৮। নন্দিতা কুণ্ডু জেলার ছাত্রীদের মধ্যে প্রথম স্থান অধিকার করে।

বার্লো বালিকা বিদ্যালয়ের বর্তমান প্রধানা শিক্ষিকা শ্রীমতী উমা সরকার। তিনি এই স্কুলেরই ছাত্রী ছিলেন। বাংলার এম· এ· শ্রীমতী সরকারের শিক্ষিকা-জীবনের অভিজ্ঞতা প্রায় ৪৫ বছরের। ১৯৪৬ সাল থেকে তিনি স্কুলের প্রধানা শিক্ষিকার দায়িত্ব পালন করছেন।

বললাম, "আপনি তো একদিন এই স্কুলের ছাত্রী ছিলেন। তখনকার সঙ্গে এখনকার ছাত্রীদের কোনও তফাত খুঁজে পান ?"

প্রধানা শিক্ষিকা বললেন, "না, তেমন কোনও বড় তফাত খুঁজে পাই না। তখনও ক্লাস ফাঁকি দেবার প্রবণতা ছিল, অমনোযোগী ছাত্রী ছিল—আজও আছে। তবে পড়াশোনার অভ্যাসটা এখন বড্ড কমে গেছে। ক্লাসের বই তো দূরের কথা, গল্পের বইও এখনকার বেশিরভাগ মেয়েই বড় একটা পড়ে না। ভাল-মন্দের বিচার পরে, আমরা হাতের কাছে যা পেতাম, বঙ্কিম রবীন্দ্র শরৎ প্রভাতকুমার, গোগ্রাসে গিলতাম। অভিভাবকদের চোখে পড়বার ভয়ে লুকিয়ে পড়তাম। আর এখন ? অভিভাবকরা সাধ্যসাধনা করলেও তারা পড়ে না।" এই পর্যন্ত বলে প্রধানা শিক্ষিকা কথার মোড় ঘোরালেন।

"পরীক্ষায় ভাল করবার জন্য বছরের প্রথম দিনটি থেকে তৈরি হতে হবে, পরিশ্রম করতে হবে। গত বছর আমি ভাল করতে পারিনি, এ-বছর ভাল করব, এই আত্মবিশ্বাস রাখতে হবে। লেখাপড়া, পরীক্ষা, এগুলো যদি মহৎ কাজ হয়ে থাকে, তাহলে চালাকি দিয়ে খুব একটা সুবিধে করা যাবে না। পড়তে হবে, লিখতে হবে, মাস্টারমশাইদের দিয়ে ভুল শুধরে নিতে হবে। এইভাবে সারা বছর ধরে সবচেয়ে কঠিন আর বিপজ্জনক খেলার জন্য ধৈর্য আর একাগ্রতার সঙ্গে তৈরি হতে হবে। হ্যাঁ, আর একটা কথা ; আড্ডা, সিনেমা, থিয়েটার, জলসা, এসব একটু কমিয়ে বেশি সময়টা দিতে হবে পড়াশুনোর পিছনে।"

বাংলা ও ইংরেজি প্রসঙ্গে প্রধানা শিক্ষিকা শ্রীমতী সরকার বললেন, "বাংলাকে অনেকে বিষয় হিসেবে ফ্যালনা মনে করে। ভাবখানা এই যে, বাংলা যখন নিজের বিষয়, তখন ভয়ের কী আছে! ভয়ের কিছু নেই ঠিকই, কিন্তু বাংলাকে অবহেলার জন্য প্রতি বছরই বিস্তর ছেলেমেয়েকে খেসারত দিতে হয়। বাংলা এবং ইংরেজি এই দুটো ভাষাতেই পাঠ্যবই

বারবার পড়তে হবে। **এখন অধিকাংশ প্রশ্নই অবজেকটিভ ধরনের, পাঠ্যবই খুঁটিয়ে না-পড়লে মুশকিল, উত্তর লিখতে গিয়ে বারবার আঙুল কামড়াতে হবে।** কঠিন কঠিন শব্দের বানান ও মানে মনে রাখতে হবে। বাংলা ব্যাকরণ কিংবা ইংরেজি গ্রামার দুটোই পড়তে হবে মন দিয়ে। ব্যাকরণ ভাল না জানলে কোনও ভাষাই ঠিকমতো আয়ত্ত হবে না। **বাংলা ইংরেজি দুই ভাষাতেই স্বাধীনভাবে লেখার অভ্যাস গড়ে তোলা দরকার।** প্রথম প্রথম ভুল তো হবেই, **লিখতে-লিখতে জড়তা কেটে যাবে, ভাবনায় ভাষায় শুদ্ধতা আসবে।** এই সঙ্গে আরও একটা কথা, নামী লেখকদের নানা ধরনের বই আর পত্রপত্রিকাও পড়াও প্রয়োজন। এতে শব্দের ভাণ্ডার মজবুত হবে, চিন্তার জগতে প্রসার ঘটবে।"

ইতিহাস সম্পর্কে প্রধানা শিক্ষিকার বক্তব্য : "অনেককে বলতে শুনেছি, ইতিহাস একটা মৃত বিষয়। এই বিষয়ে নাকি কোনও গতি নেই, প্রাণ নেই, সজীবতা নেই। আমি বলি, সবই আছে। ইতিহাস যে জানে না, ইতিহাস যে ভালভাবে পড়েনি, সে তো কিছুই জানে না বললে চলে। আগে তো দেশটাকে জানতে হবে, তারপর অন্য কথা। এত বড় দেশ ভারতবর্ষ, কত উত্থান-পতন হয়েছে, ইতিহাস না পড়লে জানবে কী করে! কাজেই ইতিহাস পড়তে হবে দরদ দিয়ে, ভালবাসা দিয়ে। দরকারমতো মুখস্থও করতে হবে।"

ভূগোল সম্পর্কে প্রধানা শিক্ষিকা মন্তব্য করলেন না, মতামত দিলেন শ্রীমতী রেণুকা লাহিড়ী। তিনি এই স্কুলের সহ-প্রধানা শিক্ষিকা, ক্লাসে ভূগোল পড়ান। "'৮৫ সালের আগে ভূগোলের পাঠ্যসূচি ছিল বেশ গোলমেলে। নতুন পাঠ্যসূচিতে সেই গোলমাল নেই। **ভূগোল পড়ার সময় সঙ্গী হিসেবে সর্বদা ম্যাপ সামনে রাখতে হবে। হাতের কাছে ম্যাপ থাকলে ভূগোল পড়তে গিয়ে গলদ্‌ঘর্ম হতে হয় না।** পৃথিবীর ভূগোল জানবার আগে ভারতের ভূগোলটাকে খুব ভাল করে বুঝতে হবে।"

প্রধানা শিক্ষিকাকে অঙ্ক সম্পর্কে জিজ্ঞেস করতেই বললেন, "অন্য আর-পাঁচটা বিষয়ের সঙ্গে অঙ্ক বিষয়টির তফাত ঠিক কোন্‌খানে তা আপনিও জানেন, আমিও জানি। আর যাদের উদ্দেশে এতক্ষণ ধরে বকবক করছি, তারাও যে জানে না, এমন নয়। জেনেও তারা অঙ্ক মুখস্থ করে, বাড়িতে অনুশীলন করে না, ভয়ে অঙ্কের থেকে শতহস্ত দূরে থাকে। এটা মোটেই ঠিক নয়। অঙ্ক মুখস্থ করার বিষয় নয়। বুঝে অঙ্ক করলে একশোর মধ্যে একশোই পাওয়া যেতে পারে, আর একটু বোঝার ভুল হলেই ব্যস্‌, রসগোল্লা।"

বিজ্ঞান সম্পর্কেও তাঁর বক্তব্য অঙ্কের মতো। "বিজ্ঞানও বুঝে পড়তে হবে। যে-বইটি ক্লাসে পড়ানো হয়, সেটি তো বটেই, সঙ্গে অন্যান্য বইও পড়তে হবে। ছবি, চার্ট, মডেল—এগুলো বিজ্ঞান পড়বার জন্য খুবই জরুরি।

"'আনন্দমেলা' ছোটদের কাছে একটা স্বপ্নের কাগজ। এত সুন্দর ছাপা, এত সুন্দর লেখা, এমন বাহারি সব ছবি—কী যত্ন করেই না ছোটদের হাতে তুলে দেন আপনারা," আনন্দমেলা সম্পর্কে উচ্ছ্বসিত প্রধানা শিক্ষিকা জানালেন, "ইশ্‌, ছেলেবেলায় আমরা যদি এরকম একটি সবপেয়েছির দেশ হাতে পেতাম!"

শ্যামলকান্তি দাশ

ক্লাস টেন-এর ফার্স্ট গার্ল

বার্লো বালিকা বিদ্যালয়ের ক্লাস টেন-এর ফার্স্ট গার্ল বাসবী সান্যাল প্রথম থেকেই এই স্কুলে পড়ছে। স্কুলের বার্ষিক পরীক্ষায় মোট ৯০০ নম্বরের মধ্যে বাসবী পেয়েছে ৭৬৫।

দিনে ৫/৬ ঘণ্টা পড়ে বাসবী। ছুটির দিনেও এই সময়ের হেরফের হয় না। ছুটির দুপুর কাটে গল্পের বই পড়ে।

বাসবীর বাবা ডাঃ অমলকৃষ্ণ সান্যাল ও মা শ্রীমতী কল্পনা সান্যাল পড়াশোনার ব্যাপারে খুব সাহায্য করেন। বাসবীর দুই দিদিও বোনের লেখাপড়ার খোঁজখবর নেন, নানা বিষয় দেখিয়ে দেন। বাসবীর কোনও গৃহশিক্ষক নেই। "গৃহশিক্ষকের দরকার হয় না।"

সমালোচনা বাসবীর প্রিয় বিষয়। যে-কোনও প্রসঙ্গ, তা যদি বাসবীর জানা থাকে, আলোচনা করতে ভাল লাগে। ওর প্রিয় খেলা ক্রিকেট, প্রিয় ক্রিকেটার গাওস্কর।

বাসবী বাংলায় চক্রবর্তী-পালচৌধুরী ও পি· আচার্যর বই পড়ে। ইংরেজিতে পড়ে

পি· কে· দে সরকার। বাসবী কাঁড়ি কাঁড়ি বই পড়ার পক্ষপাতী নয়। যে-সব বই সত্যিই উপকারী, ছাত্রছাত্রীদের কাজে লাগে, সেই সব বই-ই বেছে বেছে পড়ে। ইতিহাসে পড়ে কিরণ চৌধুরী, কল্যাণ চৌধুরীর বই। ভূগোলে অমরনাথ সেনগুপ্ত, তরুণবিকাশ লাহিড়ী, সুধীর পাল ও পান্নালাল দাসের বই পড়ে ও খুব উপকার পায়। অঙ্কের জন্য কেশবচন্দ্র নাগ, কে পি বসু এবং রায়চৌধুরী-রায়চৌধুরীর বই ওর খুব প্রিয়, এই বইগুলো থেকে খুব সাহায্য পায় বাসবী। জীবনবিজ্ঞানে অমূল্যভূষণ চক্রবর্তীর বই তো আছেই, তাছাড়াও আছে সিনহা-অধিকারী, নন্দী-গুহ-বর্ধনের বই। ভৌতবিজ্ঞানে পড়ে জে এন রায় আর চিত্তরঞ্জন দাশগুপ্তের বই। অতিরিক্ত পদার্থবিদ্যায় ডঃ অলক চক্রবর্তীর বইটিই যথেষ্ট, আর কোনও বই দেখবার দরকার হয় না বাসবীর।

ভবিষ্যৎ ইচ্ছের কথা জানতে চাইলে বাসবী বলল, "এক্ষুনি কী করে বলব! তবে আমার ইচ্ছে ইণ্ডিয়ান ইনস্টিট্যুট অব টেকনোলজিতে ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ার। সবই পরীক্ষার ফলাফলের উপর নির্ভর করছে।"

বাসবীর প্রিয় লেখক শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়, সত্যজিৎ রায়, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়, বুদ্ধদেব গুহ, সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়। এঁদের বই হাতে পেলে শেষ না করে ছাড়তে পারে না।

'আনন্দমেলা'র 'লেখাপড়া' বিভাগ বাসবীকে খুব সাহায্য করে। এই বিভাগ থেকে লেখাপড়ার ব্যাপারে ও বিস্তর সাহায্য পায়।

রোভার্সের রয়
রোভার্সের খেলোয়াড়রা ছুটি কাটাতে ক্রিটে এসেছে, যেখানে একটি লোক আঁটিছে তাদের বিপদে ফেলবার ফন্দি। সমুদ্রের ধারেই হোটেল। সবাই খুব আনন্দে আছে।
দারুণ হোটেল! আরামসে থাকা যাবে!
কপালে এত সুখও ছিল!
সারা দিন ফুর্তি লুটব!
খেলোয়াড়দের মধ্যে অনেকেই সস্ত্রীক এসেছে ...
এখানেও কি তোমরা ফুটবল খেলবে নাকি?
ওল্ডফিল্ড আর স্ট্যামব্রিজ সিটির সঙ্গে দুটো ফ্রেণ্ডলি ম্যাচ খেলব।
ওই তো ওল্ডফিল্ডের খেলোয়াড়রা!
ওরে ব্বাবা, সবাই এসে গেছে!
দু'দলে শুভেচ্ছা বিনিময়ের পর ...
তোমরাও কি এই হোটেলে আছ?
হ্যাঁ, টুর্নামেন্টে তোমাদের সঙ্গে খেলব। এবং জিতব!
বটে! এখানেই মহড়া দেওয়া যাক!
রাজি।
সুতরাং ...
এগোও ব্ল্যাকি!
এগোচ্ছি!
নাঃ, ফুটবলই এদের ধ্যান-জ্ঞান! আর-কিছু জানে না!
যা বলেছ!
ফুলপ্যান্ট পরে ভুল করেছ রয়!
রয় আছাড় খেল!
ওঃ!

(এর পরে আগামী সংখ্যায়)

মিল অমিল সুভাষ মুখোপাধ্যায়

জাহাজ তখন চলেছে দক্ষিণ আমেরিকার পশ্চিম উপকূল ছাড়িয়ে গালাপাগোজ দ্বীপপুঞ্জের ভেতর দিয়ে। এইখানে এসে ডারউইন তাঁর রোজনামচায় লিখলেন, "দেখে-শুনে আমার ভারী অবাক লাগছে।"

কেন ? না, এখানে এসে তিনি একটা অদ্ভুত জিনিস লক্ষ করলেন : দক্ষিণ আমেরিকার সঙ্গে এই সব দ্বীপের গাছপালা আর জীবজানোয়ারের চেহারার মিল থাকলেও—তাদের অধিকাংশই আলাদা জাতের। এক দ্বীপের পাখি প্রায় অন্য দ্বীপের পাখির মতোই দেখতে, তবু যেন কিছুটা আলাদা। গায়ের রঙে, গলার সুরে, বাসা বানানোর ধরনে, ডিম পাড়ার অভ্যেসে—হাজার রকমের খুঁটিনাটি তফাত। ডারউইন এই সব দ্বীপ থেকে ২৩ রকমের

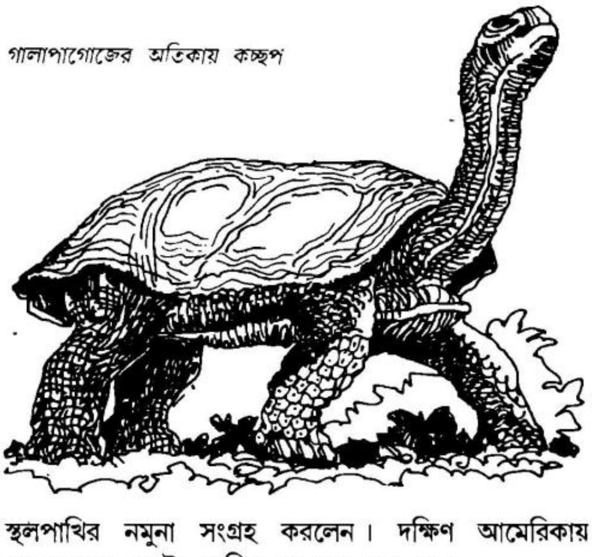

গালাপাগোজের অতিকায় কচ্ছপ

স্থলপাখির নমুনা সংগ্রহ করলেন। দক্ষিণ আমেরিকায় 'স-জাতের একটা পাখিও পাওয়া যায় না।

এই সব দ্বীপে তিনি দু' ধরনের অতিকায় কচ্ছপ দেখতে পান। কোনও-কোনওটা এত বড় যে, টেনে তুলতে আটজন লোক লাগে। এত বড় কচ্ছপ আর কোথাও মেলে না।

কেন এই মিল আর অমিল ? এর নিশ্চয় কোনও মানে আছে। ডারউইন এ নিয়ে যতই ভাবেন, ততই তাঁর মনে হতে থাকে—এ-ধাঁধার একটাই উত্তর সম্ভব। বিভিন্ন গাছপালা আর জীবজন্তুর পূর্বপুরুষ যদি এক হয়, একমাত্র তাহলেই তাদের পরেকার মিল আর অমিল বোঝা সহজ হয়। তিনি ধারণা করেছিলেন, এই সব দ্বীপের গাছপালা আর পূর্বপুরুষেরা নিশ্চয় এক সময় দক্ষিণ আমেরিকার মাটি থেকেই এসেছিল। কাছ-ছাড়া হয়ে দু' জায়গায় যুগ-যুগ ধরে থাকার ফলে তাদের আকৃতিতে ক্রমে-ক্রমে এমন পরিবর্তন ঘটে যে, পরে তারা পরস্পর পরস্পরের থেকে আলাদা হয়ে যায়। (ক্রমশ)

জেনে নাও

ফুটন্ত দুধ উথলে ওঠে কেন

ফুটন্ত দুধ অনেক সময় উথলে ওঠে কড়া থেকে। দুধ উথলে পড়ার কারণটা কী ? কই, জল ফুটলে তো উথলে পড়ে না !

জল যে-রকম, দুধ সে-রকম নয়। তাতে অনেক পদার্থই থাকে ভাসমান অবস্থায়। তার মধ্যে প্রোটিন, শর্করা আর চর্বি জাতীয় কিছু-কিছু জিনিস আছে।

দুধ যখন আস্তে আস্তে গরম করা হয়, তখন বিভিন্ন পদার্থের মধ্যে চর্বিটা আলাদা হয়ে যায়। আলাদা হয়ে এটা উঠে আসে ওপরে। দুধের চেয়ে হাল্কা বলেই এ-রকমটা হয়। দুধের ওপরে সরও পড়ে তাড়াতাড়ি।

দুধ যখন গরম করা হয়, তখন দুধের কিছুটা জল উবে যায়, তার মানে ওটা হয়ে যায় জলীয় বাষ্প। কিন্তু দুধের ওপরে সর পড়লে বাষ্প বার হতে পারে না, তাতে চাপা পড়ে যায়। আরও গরম করলে জলীয় বাষ্প আরও বাড়ে। সে চাপ এসে পড়ে সরের তলায়, আর তাই লুচির মতো ফুলে ওঠে। কিন্তু বেশি ফুললে সরের আর জলীয় বাষ্পকে রাখার ক্ষমতা থাকে না। সেটা তখন ফেটে যায়, আর দুধ উথলে পড়ে কড়ার বাইরে। অবশ্য কড়ায় একটা হাতা ডুবিয়ে দিলে জলীয় বাষ্প হাতার ওই হাতল ধরে বেরিয়ে আসে। তাই আর দুধ তখন তাড়াতাড়ি উথলে পড়ে না।

গোলাপগাছে কাঁটা কেন

প্রকৃতিতে সবাই নিজেকে শত্রুর হাত থেকে বাঁচাবার চেষ্টা করে। গাছেরাও সে-রকম। এক-এক গাছের আত্মরক্ষার উপায় এক-এক রকমের। বিছুটি গাছে আছে দংশরোম। এই দংশরোম শরীরে ঢুকে যেমন জ্বালা ধরিয়ে দেয়, তেমনি গোলাপ গাছের সারা গায়ের ছোট ছোট রোঁয়া কাঁটা হয়ে শত্রুকে ভয় পাওয়ায়। কেউ আর গোলাপ গাছে হাত দিতে সাহস পায় না।

তা-ছাড়া গোলাপ গাছ হয় সাধারণত শুকনো মাটিতে। সেইজন্যে এরা জল কম পায়। এই কম জল যাতে বেরিয়ে না যায়, সেটাও দেখা দরকার। কাঁটা হয়ে যাওয়া রোমগুলো জলকে ধরে রাখে, বাইরে বেরোতে দেয় না। অনেক সময়ে গোলাপ গাছের পাতার ডগাতেও কাঁটা থাকে। ফলে পাতা দিয়েও জল বেরোতে পারে না।

অরূপরতন ভট্টাচার্য

কাকু যেন হাওয়ায় ভেসে চলে যাচ্ছেন

মোৎসার্টকাকুর বেহালা গীতা চৌধুরী

একটা বড় পাথরের চাঙড়। অর্ধেক মাটিতে পোঁতা, অর্ধেক খাড়া উঁচু হয়ে আছে। বাবুল আর উজ্জ্বল দাঁড়িয়ে আছে একটা আমলকী গাছের তলায়। সারাদিন খুব ব্যস্ততায় কেটেছে। সেই সকালবেলায় দুই বন্ধুতে ঝোলা-কাঁধে বেরিয়েছে। সারাদিন কেটেছে বাসে। কলকাতার মতো ভিড় ছিল না। তবুও হ্যাণ্ডেল ধরে দাঁড়িয়ে মাইল-তিনেক এসেছে। বসতে জায়গা পায়নি। নেমেছে শিউলিপোতায়। সেখানে চা-বিস্কুট খেয়ে সোজা হাঁটা। প্রায় মাইল-দশেক হবে। উঁচু-নিচু মাঠ ভেঙে অনেক দূর চলে এসেছে। এখানকার মাঠ যেমন হয়, এই নামছি খাদে নদীর স্রোতের দিকে। নুড়ি পাথুরে কাঁকুরে জমি। জলের স্রোত ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর। আবার হেঁটে চড়াই। পথ বলতে কিছু নেই। হোঁচট খেতে খেতে পথ চলা। দু-একবার পড়ে গেছে দুজনেই। হাঁটু-ফাটু ছড়েছে। এমনি করে কাঁটাঝোপঝাড় এড়িয়ে টালমাটাল পাথুরে জমি পেরিয়ে বিকেল নাগাদ এখানে পৌঁছেছে। ঠিক হল, আর ওরা হাঁটবে না। এইখানে গাছতলায় রাত কাটাবে।

গরমের দিন। সারাদিন খুব তাপ। বিকেলের দিকে এখন কমেছে সেই উত্তাপের জ্বালা। হাওয়া-টাওয়া তেমন নেই। গাছের পাতা নড়ছে না। বেশ গুমোট। দূরে উঁচু-নিচু পাহাড়ের উপর হালকা ধোঁয়ার আস্তরণ। মনে হচ্ছে যেন খানিকটা মেঘ ছিঁড়ে গিয়ে নীচের দিকে নামতে নামতে পৃথিবীর গরম লেগে আর নামতে পারছে না। আবার উড়েও যেতে পারছে না।

"রাত্রিবাসের উপযুক্ত জায়গা বটে," ঝোলাটা নামাতে নামাতে উজ্জ্বল বলল।

"জল যেটুকু আছে সেটুকু ফুরিয়ে গেলে কী করবি ? আর যদি ঝড়-টড় হয় ?" বাবুল বলল।

"জল ফুরিয়ে আসছে ঠিকই। ওই গাছের ফাঁকে মনে হচ্ছে না একটা লেকের মতো দেখা যাচ্ছে। জল আছে বলেই তো জায়গাটা সবুজ। বড় বড় গাছ দেখতে পাচ্ছিস তো ?"

"চল-না দেখে আসি। খাবার মতো হলে খানিকটা নিয়েও আসা যাবে।"

দুজনে জলের সন্ধানে গেল। গিয়ে দেখল, বেশ বড়সড় পুকুর। কী সুন্দর টলটলে জল। চারদিকে শুধু কলাগাছ আর কলাগাছ। দূর থেকে অবশ্য এদিকটা নিচু বলে দেখা যাচ্ছিল না। দূরে কয়েকটি মাটির ঘর। লোকজন তেমন নেই। জায়গাটা বেশ ফাঁকা-ফাঁকা।

"জল তো বেশ পরিষ্কার মনে হচ্ছে। পাত্রটা দে, আমি জল ভরে আনছি।" বলে উজ্জ্বল বাবুলের হাত থেকে জলের পাত্রটা নিয়ে পুকুরের ধারে গেল।

"গরমের দিন। সাপের ভয় থাকতে পারে। গাছতলায় না কাটিয়ে বরং এগিয়ে দেখা যাক, কোনও জায়গা-টায়গা পাওয়া যায় কি না," বাবুল বলল।

জলের পাত্রের মুখটা বন্ধ করতে করতে উজ্জ্বল বলল, "তাই চল্। খাবার যা সঙ্গে আছে রাতে কুলিয়ে যাবে। শুধু একটা ঘুমোবার জায়গা।"

দু'জনে এগিয়ে চলল। সন্ধে হয়-হয়। পশ্চিমের আকাশ লালে লাল। সূর্যকে দেখা যাচ্ছে না। শুধু তার দীপ্তি ছড়িয়ে আছে এ-প্রান্ত থেকে ও-প্রান্ত। ডুবে যাবার আগের মুহূর্তেও সে কত সুন্দর!

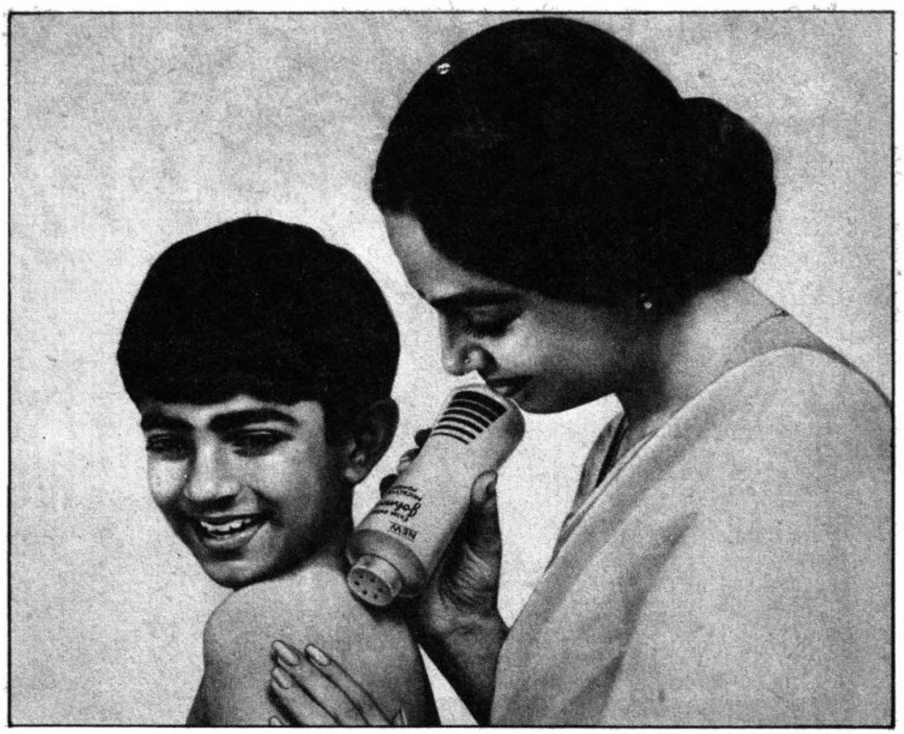

এখন পাবেন!

নতুন জনসন্স প্রিকলী হীট পাউডার

এটি কেবলমাত্র ঘামাচিতে দ্রুত আরাম আনে তা নয়, বাস্তবিক তা রোধ করতে সাহায্য করে।

ঘামাচিতে আক্রান্ত হবেন কেন, আপনি যখন তা রোধ করতে সক্ষম ?
এখন আরো কার্য্যকরীভাবে আপনি আপনার ঘামাচি সংক্রান্ত সমস্যাকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারেন। নতুন জনসন্স প্রিকলী হীট পাউডার। এটি কেবলমাত্র ঘামাচিতে দ্রুত আরাম আনে তা নয়, বাস্তবিক তা রোধ করতে সাহায্য করে!

নতুন জনসন্স প্রিকলী হীট পাউডার আরো বেশি কার্য্যকরী কেন ?
আপনি যখন ঘেমে একেবারে নেয়ে ওঠেন, এবং যখন এই ঘাম আপনার ত্বকে বেশিক্ষণ ধরে থেকে যায়, তখনই আপনি ঘামাচির সম্ভাব্য শিকার হ'তে পারেন। ঠিক এই কারণেই নতুন জনসন্স প্রিকলী হীট পাউডার এত কার্য্যকরী।

ঘাম ভালভাবে ও দ্রুত শুষে নেবার উপযুক্ত করে বিশেষ ফরমূলাতে তৈরী করা হয়েছে। তাছাড়া এটি ত্বকের ওপর ব্যাকটিরিয়া সংক্রমণ রোধ করে। তাই আর লালচে র‍্যাশ নয়, নয় কোনো জ্বলুনি বা চুলকানি। সত্যি কী দারুণ আরাম। অধিকন্তু, নতুন জনসন্স প্রিকলী হীট পাউডার এখন একটি মনমাতানো নতুন সুগন্ধে সমৃদ্ধ।

আগামী গ্রীষ্মে ঘামাচিতে আক্রান্ত হওয়া পর্য্যন্ত অপেক্ষা করবেন না, তাড়াতাড়ি নতুন জনসন্স প্রিকলী হীট পাউডারের একটি প্যাক নিন। শুধু শুধু ঘামাচিতে কষ্ট পাবেন কেন, আপনি যখন তা রোধ করতে পারেন ?

৩ ভাবে কাজ করার জন্য বিশেষ ফরমূলাতে তৈরী:

ঘাম আরো ভালভাবে ও দ্রুত শুষে নেয়।

ত্বকে ব্যাকটিরিয়ার সংক্রমণ রোধ করার জন্য এতে আছে বিশেষ ঔষধি।

আরামপ্রদ ভাবে কার্য্যকরী বলে ত্বককে ঠাণ্ডা ও তরতাজা রাখে।

Johnson & Johnson

OBM/4181 BEN

"কেমন লাগছে তোর ?" উজ্জ্বল জিজ্ঞেস করল।

"দারুণ। তোর কেমন লাগছে ?"

"অপূর্ব ! প্রকৃতিকে দেখতে হলে মাঝে-মাঝে এরকম বেরিয়ে পড়তে হয়। ঘরে বসে শুধু প্রাকৃতিক শোভার বর্ণনা পড়লেই হয় না।" উজ্জ্বল বলল।

দুজনে হাঁটতে লাগল।

"অন্ধকার হয়ে আসছে। তাড়াতাড়ি এগিয়ে চল্। সামনের ঘরগুলোয় একটু খোঁজখবর নেওয়া যাক। যদি কোনও ব্যবস্থা করা যায়।"

মাটির ঘর যে কয়েকটি তারা দেখল সেগুলো একটু দূরে-দূরে। লোকজন থাকে বলেই তাদের মনে হল। কিন্তু উজ্জ্বল আর বাবুল যে-ঘরটির সামনে এসে দাঁড়াল মনে হল সেটা ফাঁকা। কেউ থাকে না। জীর্ণ অবস্থা। ভেঙে পড়েছে মাটির দেওয়াল। চারিদিক শুকনো খটখটে। গাছের চিহ্নও নেই। কিছু জংলি গাছ ছাড়া। কেন যে এই ঘরটি এভাবে পড়ে আছে তারা ঠিক বুঝল না। ঘরের ভেতরটা উঁকি দিয়ে একবার দেখে নিল উজ্জ্বল। সামনে একটা দাওয়া। তাও অর্ধেক ভেঙে পড়েছে। তারা ঠিক করল রাতটা এই দাওয়াতেই কাটাবে। দরকার হলে ভেতরে চলে যেতে পারবে। গরমের দিন। বাইরে থাকা ছাড়া উপায়ই নেই।

"আমাদের যদি কেউ খারাপ লোক ভাবে ?" বাবুল প্রশ্ন করল।

"কেন ভাববে। আমাদের সঙ্গে তো আর কোনও অস্ত্রশস্ত্র নেই ?"

"আর যদি কোনও ডাকাত-ফাকাত আসে ? আমাদের আক্রমণ করে ?"

"তা করলেও করতে পারে। তবে বিশেষ লাভ হবে না। আমাদের সঙ্গে তেমন কিছু তো আর নেই ? শুধু হাতঘড়ি আর টাকা পয়সা ছাড়া। এগুলোকে এক্ষুনি কোথাও সরিয়ে ফেলতে হবে।"

আস্তে আস্তে সন্ধে বিদেয় নিল। রাত বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে মাথার উপর পূর্ণচন্দ্র। পূর্ণিমা হয়তো। খানিক বাদে ফুটফুটে জ্যোৎস্নায় চারিদিক ঝলমল করে উঠল। উজ্জ্বল আর বাবুল একই স্কুলের ছাত্র। ওরা ঠিক করে রেখেছিল মাধ্যমিক পরীক্ষার পর একসঙ্গে কাছাকাছি কোথাও বেড়াতে যাবে। উজ্জ্বল বাবুলের সহপাঠী হলেও বছর-দুয়েকের বড়। উজ্জ্বলের প্রস্তাবেই বাবুল গ্রামে তার কাকার বাড়ি চলেছে। অবনীবাবু উজ্জ্বলের কাকা। বড় আত্মভোলা মানুষ। গ্রামে থাকেন বরাবর। বিয়ে-থা করেননি। ছাত্র পড়ান। গ্রামে একটি স্কুলে শিক্ষকতা করেন। কলকাতায় আসেন খুব কম। গ্রামের শান্তস্নিগ্ধ পরিবেশ তিনি পছন্দ করেন। শহরের কলকোলাহল তাঁর ধাতে সয় না। ছোট্ট একটা বাড়ি বানিয়ে উজ্জ্বলের কাকা সেই কবে থেকে গ্রামেই আছেন। উজ্জ্বল অবশ্য কাকার কাছে এসেছে এর আগেও দু-একবার। বাবা মায়ের সঙ্গে। একমাত্র ভাইপোকে তিনি বড্ড ভালবাসেন। যতবারই সে গ্রামে এসেছে ততবারই নতুন নতুন জিনিস উপলব্ধি করতে শিখেছে। তাছাড়া অবনীবাবু নিজহাতে একটা বাগানও বানিয়েছেন। সেখান থেকে দু-একবার সবজি পাঠিয়েছেন উজ্জ্বলদের বাড়িতে।

চাঁদের আলোতে বসে উজ্জ্বল বলছিল, "কাকা দারুণ বেহালা বাজান। একটু পাগলাটে মানুষ। কিন্তু কাকার বেহালা বাজনা শুনলে তুই চঞ্চল হয়ে উঠবি। কী অসাধারণ সেই সুরসৃষ্টি। মায়ের কাছে শুনেছি কাকু ছোটবেলা থেকেই বেহালা বাজাতে ভালবাসতেন। কোনও নির্জন জায়গা পেলেই কাকা চলে যেতেন বেহালা নিয়ে। সম্ভবত সেই সুরের ইন্দ্রজালই তাঁকে গ্রামের নির্জন পরিবেশে পাঠিয়ে দিয়েছে। আমি কাকুকে মাঝে-মাঝে মোৎসার্টকাকু বলে ডাকি।"

উজ্জ্বলকে বেহালা শিখতে বরাবরই উৎসাহ দিতেন তিনি। বলতেন, সঙ্গীত শিখলে ছেলেবেলা থেকেই শেখা উচিত। সঙ্গীতের সঙ্গে যোগাযোগ না থাকলে অর্থাৎ আত্মিক উপলব্ধি না ঘটলে মনের জগৎ বড় হয় না।

"ঠিক করে রেখেছিলাম যে, পরীক্ষা শেষ হয়ে গেলে গানবাজনায় মন দেব। বিশেষ করে এই সময়টাকে কাজে লাগানো যেতে পারে। এতদিনে আমার সুমতি হয়েছে জানলে কাকা খুশি হবেন।" উজ্জ্বল কথা শেষ করল।

দুজনেই খুব ক্লান্ত। সারাদিন অনেক হেঁটেছে। ইচ্ছে করলেই তারা ট্রেনে করে গ্রামের কাছাকাছি চলে আসতে পারত। কিন্তু তাতে কোনও বাহাদুরি থাকত না। এই বন্ধুর পথে উজ্জ্বল একবার কাকার সঙ্গে গ্রামে এসেছিল। বছর-কয়েক আগের কথা। পথটা তার চেনা। মনে-মনে ঠিকও করে রেখেছিল, একবার সে একলাই চলে আসবে। বাবুলকে সঙ্গী পেয়ে তার আরও ভাল লাগল।

সারা আকাশ তারায় ভর্তি। এদিক-ওদিক যতটা চোখ যায় তাকিয়ে রইল। চারদিকে কী নিস্তব্ধতা। এখন পাখির কোলাহল নেই। দূরের গাছগুলো মাথা তুলে অনড় শান্ত দাঁড়িয়ে আছে। দূরের পাহাড় দিগন্তে মিলিয়ে গেছে। চোখেই পড়ে না। মাথার উপর বিশাল আকাশ। দুজনে বসে আছে। কোনও তাড়া নেই। চিন্তা নেই। সামনে অনেক সময়। পথ দীর্ঘ। মুক্তির স্বাদ পেল। দাওয়ায় শুয়ে আকাশ দেখতে দেখতে কত কথাই না হল তাদের। তারপর একসময় ঝোলা থেকে খাবার বার করল। দুজনে মিলে খেয়ে নিল। সারাদিন ভাত খাওয়া হয়নি। সেই সকালবেলায় ভাত খেয়ে বাড়ি থেকে বেরিয়েছিল। তারপর সারাদিন তেমন কোনও ভারী খাবার পথে খাওয়া হয়নি। খাওয়া সেরে উজ্জ্বল আর বাবুল দাওয়ায় শুয়ে ঝোলাটা মাথায় দিয়ে আকাশ দেখতে লাগল। ক্লান্ত শরীরে ঘুম আসতে সময় লাগল না। গভীর ঘুমে তারা ডুব দিল।

পরদিন খুব ভোরে বাবুলের ঘুম ভেঙে গেল। জেগে দেখল, নাঃ, তাদের কোনও ক্ষতি হয়নি। ঝোলাটার ভেতরে হাত দিয়ে দেখল যেমন ছিল সব তেমনই আছে। টাকাপয়সা আর হাতঘড়ি ঘরের ভেতর লুকনো আছে।

বাবুলের ঘুম আগে ভেঙেছে বলে সে নিজে-নিজে একটু হাসল। প্রতিবার তাকে ঘুম থেকে তুলে দিতে হয়। খুব ভোরে ওঠার অভ্যেস তার নেই। ঘরের ভেতর থেকে ঘড়ি আর টাকাপয়সার থলিটা বার করে নিয়ে এল। পাঁচটা বেজে পনেরো। এ-সময়টা বেরোতে পারলে খুব ভাল হয়। এই ভেবে সে উজ্জ্বলকে ডাকল।

একটু একটু হাওয়া দিচ্ছে। বড় মনোরম পরিবেশ। ভোরবেলাটা যেন আরও সুন্দর লাগল তাদের। কিন্তু গরমের

দিন। বেলা বাড়লে রোদের তাপও বাড়বে। তাই তারা ঠিক করল এই সকালেই হাঁটা শুরু করবে। পথে কিছু খেয়ে তো নিতেই হবে। কিন্তু এত সকালে চা-বিস্কুট ছাড়া আর কি কিছু পাবে ? বেশি দেরি না করে ঝোলা-কাঁধে তারা বেরিয়ে পড়ল।

ঘন্টাখানেকের পথ। উজ্জ্বলের মনে আছে। পথে একটা সরু সোঁতা পড়বে। সেটা পার হলেই মিনিট-পাঁচেক পথ পায়ে হেঁটে তাদের গ্রাম। উজ্জ্বলের কাকার বাড়ি। সোঁতাটায় জল প্রায় শুকিয়ে গেছে। লোকে নাম দিয়েছে দুঃখীসোঁতা। কেন যে এই নাম দিয়েছিল, উজ্জ্বলের মনে নেই। সম্ভবত জল থাকে না বলেই স্থানীয় লোকেরা এই নামে ডাকে। বাবুল আর উজ্জ্বল হাঁটতে হাঁটতে অনেকখানি চলে এসেছে। পথে দু-একটা ছোট্ট চায়ের দোকান ছিল বটে, কিন্তু ভাল খাবার বা ভাল বিস্কুট না থাকায় তারা ঠিক করল আরেকটু এগিয়ে বড় দোকান থেকে জলখাবার খেয়ে নেবে। বড় দোকানের খোঁজ তারা স্থানীয় গ্রামবাসীদের কাছ থেকেই পেয়েছিল।

একটানা খানিকটা হাঁটার পর তারা মোড়ের ধারে মোটামুটি বেশ বড় দোকান দেখতে পেল। দোকানটায় খাবার আছে প্রচুর। সকালে দোকানদার গরম-গরম কচুরি ভাজছে। মহা উৎসাহে তারা সেই গরম কচুরি আর কয়েকটি গরম জিলিপিও খেয়ে নিল। সেই সঙ্গে চা। খালিপেটে এতখানি হাঁটার পর মনের মতো জলখাবার খেয়ে দুজনেই পরিতৃপ্ত। দাম চুকিয়ে চলে যাবার সময় কী ভেবে তারা কয়েকটি লেবু আর কলাও কিনে নিল। জলের পাত্রে জল আগেই ভরে নিয়েছিল। তারপর আবার হাঁটতে শুরু করল।

গরমের দিন। কত সকালে তারা বেরিয়েছে। ঘন্টাখানেক হেঁটে এসেছে। এর মধ্যে ঘামতে শুরু করেছে। সকালের নরম রোদ কেটে গেছে। রোদের তাপ বাড়ছে। বেলাও বাড়ছে। এই তাপ আস্তে-আস্তে ভয়ানক হবে। গায়ে জ্বালা ধরবে। তবুও তারা খুব প্রফুল্ল। ফুর্তিতে গুনগুন গান করতে করতে একসময় সেই সোঁতাটার কাছে এসে পৌঁছল।

কিন্তু সোঁতাটার কাছে এসে ওপারে তাকিয়েই উজ্জ্বল খুব অবাক হয়ে বলল, "মোৎসার্টকাকু না ?"

সোঁতাটার ওপারে একটু দূরে দাঁড়িয়ে আছেন স্বয়ং অবনীবাবু। উজ্জ্বলের কাকা। তাদের দেখে একটু যেন এগিয়ে এলেন। উজ্জ্বল বাবুলকে চিনিয়ে দিল। ভেবেছিল হঠাৎ বাড়িতে গিয়ে কাকুকে অবাক করে দেবে। কিন্তু সেটা আর হল না।

এই সকালে কাকুকে এখানে দেখতে পেয়ে তারাই বরং অবাক হয়ে গেল। কাকু এখানে কী করছেন ? একা একা ? নাকি তাদের আসার খবর পেয়ে তিনি চলে এসেছেন। কিন্তু এত আস্তে আস্তে তিনি কেন আসছেন ? হয়তো তাঁর শরীর ভাল নেই। তারা দেখতে পেল কাকু এগিয়ে এসে কী ভেবে যেন আবার ফিরে যাচ্ছেন। তবে কি তাদের দেখতে পাননি কাকু ! উজ্জ্বল ভাবল।

উজ্জ্বল ডাকল, "মোৎসার্টকাকু !"

একটু একটু হাওয়া। মনে হচ্ছে কাকু সেই অল্প হাওয়াতেই যেন দুলে দুলে ভেসে ভেসে চলে যাচ্ছেন।

বাবুল বলল, "আমাদের ডাক শুনতে পাননি বোধহয়।" নিশ্চয় কানে শুনতে পাচ্ছেন না। তাঁর শরীরটাও ভাল নেই বোধহয়। তাঁকে সাহায্য করা দরকার। নানা কথা ভেবে উজ্জ্বল আর বাবুল আরও জোরে পা চালিয়ে দিল। তারা তাড়াতাড়ি এগোলেও কাকুর কাছাকাছি কিছুতেই পৌঁছুতে পারছিল না। তাঁর চলে যাবার গতিও যেন বেড়ে গেল। মনে হল, কোথা থেকে একরাশ বাতাস এসে কাকুকে আরও ঠেলে নিয়ে গেল।

উজ্জ্বল আর বাবুল পরস্পরের মুখ-চাওয়াচাওয়ি করল। কেমন যেন একটা রহস্য রয়ে গেল। তারা প্রায় দৌড়োতে লাগল। সামনের বাঁকটা ঘুরলেই কয়েকটা বাড়ির পরেই কাকার বাড়ি। তারা কাকাকে অনুসরণ করতে লাগল। কিন্তু পথের শেষে মোড় ঘুরতেই তারা কাকুকে আর দেখতে পেল না।

অবশেষে উজ্জ্বল আর বাবুল বাড়িতে এসে পৌঁছল। দেখল অনেক লোকের ভিড়। স্কুলের ছাত্ররা আর গ্রামবাসীরা বাড়িতে ভিড় করে দাঁড়িয়ে আছে। খাটের উপর শুয়ে আছেন তাদের প্রিয় মোৎসার্টকাকু। গত রাতে তিনি হার্টফেল করে মারা গেছেন। উজ্জ্বল বুঝল। তারা কাকুকে ঠিকই দেখেছিল। তবে সশরীরে নয়। অশরীরে। কখন যেন একফাঁকে কাকু এসে এখানে শুয়ে পড়েছেন। কাকু হয়তো জানতে পেরেছিলেন যে, তারা গ্রামে বেড়াতে আসছে, তাই তিনি তাড়াতাড়ি তাদের নিয়ে আসতে গিয়েছিলেন। নইলে উজ্জ্বলের সঙ্গে কাকুর তো আর দেখাই হত না। গ্রামের লোকজন হয়তো এতক্ষণে কাকুর দেহটাকে পুড়িয়ে ফেলত। কিন্তু তারা কাকুকে এভাবে দেখবে, এ যে কল্পনাতীত। উজ্জ্বল, বাবুল পাথরের মতো দাঁড়িয়ে রইল। কত আশা নিয়ে তারা কাকুর কাছে এসেছিল। উজ্জ্বল যে কথা দিয়েছিল বেহালা বাজানো শিখবেই ! কিন্তু এ প্রতিশ্রুতি কার কাছে থাকবে ! তার কাকু হয়তো অভিমান নিয়ে চলে গেলেন ! চিরদিন একা-একা থেকেছেন। তাই চলে যাবার সময় কাউকে না জানিয়েই চলে গেলেন ! নাকি একমাত্র ভাইপোকে এইভাবে উপলব্ধি করতে শেখালেন অনেক কিছু।

উজ্জ্বলের সম্বিৎ ফিরে এল। সে ভিড় ঠেলে তাড়াতাড়ি বাড়ির মধ্যে চলে গেল। সোজা গেল কাকুর ঘরে। কাকুর প্রিয় বেহালা ঘরের একপাশে ঢাকা দেওয়া আছে। কতদিনের পুরনো এই বেহালা। ঘরের চারদিক একবার ভাল করে তাকাল। তার প্রিয় কাকুর ঘর। মোৎসার্টকাকু। কান্না ঠেলে এল উজ্জ্বলের চোখে। না, এখন আর ভাল করে দেখার সময় নেই। দু'হাত দিয়ে ধরল কাকুর বেহালাটা। উজ্জ্বলের মনে হল, এই বেহালা তার কাছে কত ভারী।

পিঠে হাত পড়তেই উজ্জ্বল চমকে উঠল। তাকিয়ে দেখল, বাবুল। বাবুল কখন এসে পেছনে দাঁড়িয়েছে। সে বুঝতে পারেনি।

উজ্জ্বলের হাত ধরে বাবুল কাকুর খাটের কাছে নিয়ে গেল। চিরনিদ্রায় শুয়ে আছেন অবনীবাবু। সকলের প্রিয় তিনি। প্রিয় ছাত্রদের। প্রিয় গ্রামবাসীদের। প্রিয় উজ্জ্বলের। বাঁ হাত দিয়ে বেহালাটা বুকে আঁকড়ে ধরে রইল উজ্জ্বল। ডান হাতটা কাকুর পায়ে আস্তে আস্তে ছোঁয়াল। খাটের কোনায় মাথা রেখে ডুকরে কেঁদে উঠল।

ছবি : প্রবীর সেন

কাভুরুর কথা আপনাকে কে বলেছে ? কতটুকু বলেছে ?
মার্কিন পাইলট নিল ব্রাউন বলেছে ।
টারজান
এডগার রাইস বারোজ
লোকটিকে মনে আছে।
কিন্তু সে প্রতিজ্ঞা করেছিল, কিছু বলবে না ।
লোকটা জুয়াড়ি । পাওনা মিটিয়ে আমি তাকে গুণ্ডার হাত থেকে বাঁচাই ।
অর্থাৎ টাকা দিয়ে খবর কিনেছেন !
ইভন লাগলিয়েনের আসল মতলব, কাভুরু উপজাতির কাছ থেকে অনন্ত যৌবনের রহস্যটা জেনে নেওয়া । টারজান জানেন, কাজটা বিপজ্জনক ।
আমি কাভুরুর লোকদের সব বুঝিয়ে বলব।
আমি জানি, তাদের বোঝানো যাবে না ।
কাভুরুর লোকদের না-ঘাঁটালেই ভাল ।
নিল ব্রাউন শূন্যপথের ম্যাপ এঁকে দিয়েছে, সেই গ্রামে আমি যেতে পারব । শুধু একজন সঙ্গী চাই ।
সেই গ্রামে ঢুকলে আপনি জ্যান্ত বেরিয়ে আসতে পারবেন না ।
এবারে আমি ঘুমোতে চললুম ।
কিন্তু ...
সেই গ্রামে গিয়ে আমরা মরতে বসেছিলুম । আর কথা বাড়িয়ে লাভ নেই ।
ইভন কাল সকালে নাইরোবিতে ফিরবে । তুমি কি বুইরার জন্যে চিন্তিত ?
যা হয়েছিল, তাই ভাবছিলুম ।
"ইদেনি কাভুরু বাঁচিয়ে দিয়েছিল আমাদের ...
"কিন্তু বলেছিল ...
এই সুড়ঙ্গ দিয়ে জঙ্গলে পালাও টারজান । আর কখনও এখানে ফিরে এসো না ।
(এর পরে আগামী সংখ্যায়)

ধাঁধা

এক-একটা ছুটির দিন এমন আসে, যেটা সত্যিই মনে হয় ছুটির দিন। কী, অবাক লাগছে শুনে? ভাবছ, ছুটির দিন তো সব-সময়ই ছুটির দিন। তার মধ্যে আবার আলাদা ব্যাপার কী আছে?

সেই কথাটাই তো বলতে চাইছি আমিও। মানে, আমার কাছে ছুটির দিন দু-রকম। একরকম হল, ছুটির, কিন্তু সেই সঙ্গে ছোটাছুটির দিন। আর দ্বিতীয় রকম হল, যে-ছুটির দিনে কিছু করার থাকে না। কী, এবার বুঝতে পারলে তো? ছুটির দিন মানেই সব-সময় ছুটির দিন নয়। কখনও-বা ছোটাছুটির দিন। এবার তাহলে বলি, কথাটা কার। কথাটা বলে ছোট্‌কা। যেমন আজই বলল। আজ, মানে মে-দিবসের ছুটির দিনে সকালবেলা ছোট্‌কা বলল, আজকের দিনটায় ছোটাছুটি নেই। এ হল সত্যিকারের ছুটির দিন। আর তাইতেই আমি গেলাম ফাঁপরে পড়ে। কোথায় জম্পেশ ধাঁধা নেব, তা না, ছোট্‌কা বলল, তোর সাধারণ জ্ঞানের পরীক্ষা নেব। বলে আমার হাতে একটা কাগজ দিল ধরিয়ে। তাতে কী লেখা ছিল জানো?

যা লেখা ছিল, সেটা হুবহু তুলে দিচ্ছি। ছোট্‌কা এটাকে সাধারণ জ্ঞান বলে বলুক, আমি বলব ধাঁধা।

প্রথম ধাঁধা ॥ মানুষের দেহ হল মন্দির। কিন্তু সেই মনুষ্যদেহ সম্পর্কে তুমি কতটুকু জানো? নীচে দুদিকের কলমে এলোমেলোভাবে ছড়িয়ে-দেওয়া দেহ-সম্পর্কিত তথ্যগুলিকে সঠিকভাবে জোড় বাঁধাও। অর্থাৎ, বাঁ দিকের প্রশ্নের সঠিক উত্তর ডানদিকের কোথায় আছে তা বার করতে হবে।

১	পাঁজরের সংখ্যা	(ক) ৯৮·৬
২	দেহের স্বাভাবিক তাপাঙ্ক	(খ) ৫
৩	স্থায়ী দাঁতের সংখ্যা	(গ) প্রায় ২০
৪	ইন্দ্রিয়ের সংখ্যা	(ঘ) ২
৫	কিডনি বা বৃক্কের সংখ্যা	(ঙ) ৩২
৬	অস্থির সংখ্যা	(চ) ৩৩
	ক্ষুদ্রান্ত্র বা স্মল ইনটেসটাইনের দৈর্ঘ্য (ফুটের হিসেবে)	(ছ) ২৪
	মেরুদণ্ডে হাড়ের সংখ্যা	(জ) ২০৬

দ্বিতীয় ধাঁধা ॥ এক বালতি জলের ওজন কমাতে হলে কী যোগ করতে হবে?

তৃতীয় ধাঁধা ॥ পরের সংখ্যাটি কত হবে?

১, ১০, ১৮, ২৫, ৩১, ৩৬,

গতবারের উত্তর ॥ (১) ন'টি ছাগল, ১৮টি মুরগি। (২) ALONE. (৩) ৪৮, ৯৬

সত্যসন্ধ

শব্দ-সন্ধান

১			২	■	■	■
	■	■	৩		৪	■
৫	৬	.	■	■	৭	
■		■	■	■		■
৮		■	■	৯		১০
■	১১		১২	■	■	
■	■	■	১৩			

সংকেত : পাশাপাশি : (১) পদ্মফুল (৩) নূপুর। (৫) দশ দিন। (৭) চাঁদ (৮) কোনও-কিছু আলোকে আড়াল করলে যা দেখা যায়। (৯) ব্যয়। (১১) বিখ্যাত জলপ্রপাত (১৩) কয়েকটি থানার সমষ্টি।

উপর-নীচ (১) ধর্মযুদ্ধে নিহত ব্যক্তি (২) হালকা (৪) কিসে জ্বালাতনে আছিল সবাই? (৬) চাঁদোয়া। (১০) চোখের অলংকার, তবে বিনা দরকারে কেউ বড়-একটা পরে না। (১২) একই শব্দ দিয়ে শূন্যস্থান পূরণ করো গোটা — ঘুরেও একশো — চিনির যোগাড় হল না

রঞ্জন

সমাধান আগামী সংখ্যায়

গত সংখ্যার সমাধান

ত	দ	ন্ত	■	বি	শ	ল্য
■	নু	■	■	■	জা	■
গা	জ	ন	■	পা	রু	ল
ণ্ডি	■	রু	মা	ল	■	টা
ব	প	ন	■	ক	চু	রি
■	ন্ন	■	■	■	মু	■
ট	গ	র	■	শি	ক	ড়

মজার খেলা

এবারের মজার খেলা দেখতে সহজ, উত্তর করাটাও কঠিন নয়। কিন্তু মজার।

বারোটা কাঠি—দেশলাইকাঠি বা টুথপিক যা হয়—যোগাড় করো। কাঠিগুলো দিয়ে নীচের ছবির মতো একটা বর্গক্ষেত্র তৈরি করো যার মধ্যে আবার ছোট-ছোট চারটি বর্গক্ষেত্র—

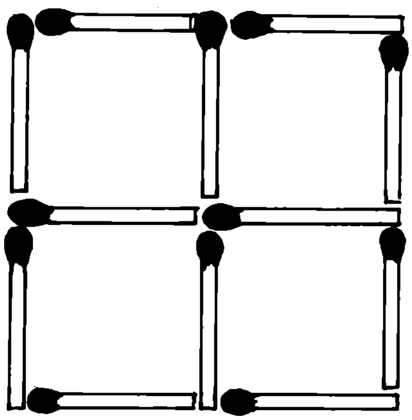

এবার শোনো, কী করতে হবে। চারটি কাঠি সরিয়ে ফের এমনভাবে বসাতে হবে যাতে কিনা মোট দশটি বর্গক্ষেত্র তৈরি হয়।

সমস্যা তো শুনলে। এবার সমাধান করো। আগে নিজে তো করো, পরে না-হয় বন্ধুদের সামনে খেলাটা দেখাবে।

দশ মিনিট সময় দিলাম। এর মধ্যে সমাধান চাই। ঘড়ি দেখছি—১, ২, ৩, ৪—

বাঃ, হয়ে গেছে। জানতাম হবে। আমার উত্তরটা নীচে দিয়ে দিচ্ছি। তোমরা বরং মিলিয়ে নাও আমারটা ঠিক হয়েছে কি না—

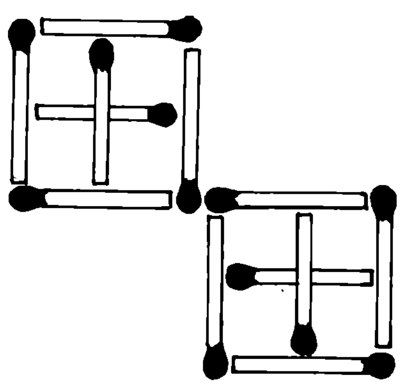

কী, হয়েছে তো?

মজারু

হাসিখুশি

"তিনি আজ সারাদিন কাজকর্ম ফেলে রেখে গাছের তলায় বসে সময় নষ্ট করেছেন।"

"তা তুমি জানলে কী করে?"

"আমি যে প্রথম থেকেই তাঁর দিকে নজর রেখেছিলাম।"

দুই অভিভাবকে কথা হচ্ছিল। দুজনের ছেলেই বাইরে থেকে পড়াশোনা করে। প্রথম অভিভাবক বললেন, "আমার ছেলের চিঠি এলে আমাকে অভিধান দেখতে হয়।"

তাঁর মুখের কথা কেড়ে নিয়ে দ্বিতীয় অভিভাবক বললেন, "তবু তো ভাল। আমাকে যে ব্যাঙ্কের পাশবই দেখতে হয়।"

এক কৃপণ ভদ্রলোক চাঁদা দেবার ভয়ে বাড়ির দরজায় সব সময় 'কুকুর হইতে সাবধান' লেখা বোর্ড টাঙিয়ে রাখেন। একদিন সকালে ঘুম থেকে উঠে দেখলেন সেই বোর্ডের নীচে আরও একটি বোর্ড ঝুলছে। তাতে লেখা: 'চাঁদা দেবার ভয়ে নিজেকে কুকুর সাজানো কি ঠিক?'

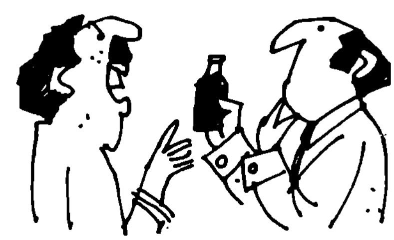

পশু-চিকিৎসক একটি ওষুধের শিশি ভদ্রলোকের হাতে ধরিয়ে দিয়ে বললেন, "নিন, আপনার কুকুরকে দু'চামচ করে খাওয়াবেন।"

কথা শেষ হওয়ার আগেই বাধা দিলেন ভদ্রলোক, "কিন্তু ডাক্তারবাবু, আমার কুকুর যে চামচে খেতে শেখেনি এখনও।"

বাবা জিজ্ঞেস করলেন, "হঠাৎ বিপদ এলে তুমি আগে কাকে বাঁচাতে চেষ্টা করবে পাপান? মা'কে না আমাকে?"

চটপট জবাব দিল পাপান, "আমাকে।"

সেলুনে ভূত-প্রেত, খুন-জখমের ছবি টাঙানো রয়েছে দেখে এক ভদ্রলোক সেলুনের মালিককে জিজ্ঞেস করলেন, "দোকানে এত লোমহর্ষক ছবি রেখেছেন কেন? এতে অসুবিধা হয় না?"

একগাল হেসে জবাব দিল মালিক, "অসুবিধা হবে কেন? ভয়ে খদ্দেরদের চুল খাড়া হয়ে উঠলে আমারই তো কাটতে সুবিধে।"

ছবি: দেবাশিস দেব

তোমরা যারা আর ছোট্টটি নও, তাদের জন্য দারুণ খবর

ডাকটিকিট জমানোয় কেন তোমাদের আগ্রহী হওয়া উচিত আর কীভাবেই বা আজ থেকে তা শুরু করবে !

ডাকটিকিট জমানোর নেশা যে আজ পৃথিবীতে এত জনপ্রিয়, তার অনেকগুলি কারণ আছে। বিনিময়ের মাধ্যমে বন্ধুত্বতা, বিভিন্ন দেশ, জনসাধারণ, জীবজন্তু, মহাকাশ, খেলাধুলো সম্পর্কে জ্ঞানসঞ্চয় ... এ-ছাড়া আরও অনেক আকর্ষণীয় বিষয়, যা নিয়ে গড়ে উঠেছে ডাকটিকিটের মজার জগৎ।

তোমরা নিজেরাই বুঝতে পারবে, যে-কোনো সময়ই ডাকটিকিট সংগ্রহ শুরু করার সেরা সময়। একঘেয়ে হয়ে যাওয়ার প্রশ্নই ওঠে না! এই নতুন নেশা তোমাদের প্রতিটি মুহূর্ত উপভোগে মশগুল করে রাখবে।

আজই শুরু করে দাও   হাতে পেয়ে দাম দেওয়ার সুবিধা !

কম সময়ের সোজা মজা! তোমাদের প্রিয় বিষয়গুলি বেছে নিয়ে স্রেফ কুপনটি ভর্তি করে চিনার-কে ডাকে পাঠিয়ে দাও। কয়েকদিনের মধ্যেই স্ট্যাম্প প্যাকেট তোমাদের কাছে পৌঁছে যাবে, যাতে দ্রুত সংগ্রহ বাড়াতে পারো তার জন্যে ১০টি ডাকটিকিট দেওয়া হবে একেবারে বিনে পয়সায়। **আগাম টাকা পাঠালে এই হিসেবে পাঠাবে**—ন্যূনতম অর্ডার ৫০ টাকা + ৫ টাকা ডাকখরচ। ১০০ টাকা অথবা তার বেশি টাকার অর্ডারে ডাকখরচ ফ্রি!

ভি পি পি-তে অর্ডার পাঠালে : ন্যূনতম অর্ডার ১০০ টাকা + ৫ টাকা ডাকখরচ। সমস্ত অর্ডারেই স্ট্যাম্পের মূল্যের ওপর ১০% বিক্রয় কর। বাবা-মার অনুমতি নিয়ে তবেই ভি পি পি অর্ডার দেবে।

চিনার কে ?

—ভারতে ডাকটিকিটের বৃহত্তম আমদানি ও রপ্তানিকারক।

—ইউ এস এস আর-এর ডাকটিকিটের একমাত্র ভারতীয় ডিস্ট্রিবিউটর।

—এমন এক সংস্থা যাঁরা প্রকৃত সংগ্রাহকদের নিত্যনতুন ডাকটিকিট যুগিয়ে চলেন।

তাড়াতাড়ি! আজই তোমাদের কুপন ডাকে পাঠিয়ে দাও।

যতটির প্যাকেট চাও, তাতে গোল দাগ দাও — ডাক টিকিট

বিষয়	১০	২৫	৫০	১০০
☐ মহাকাশ	৩·৭৫	৮·০০	১৫·০০	৪৫·০০
☐ খেলাধুলা	৩·৭৫	৮·০০	১৫·০০	৪৫·০০
☐ পরিবহণ	৩·৭৫	৮·০০	১৫·০০	৪৫·০০
☐ কলা	৩·৭৫	৮·০০	১৫·০০	৪৫·০০
☐ ফুল	৩·৭৫	৮·০০	১৫·০০	—
☐ জীবজন্তু	৩·৭৫	৮·০০	১৫·০০	—
☐ সমুদ্র-জীবন	৩·৭৫	৮·০০	১৫·০০	৪০·০০*
☐ চিত্রকলা	৩·৭৫	৮·০০	১৫·০০	—
☐ লেনিন	৩·৭৫	৮·০০	১৫·০০	২৫·০০**
☐ গাছপালা ও জীবজন্তু		—	—	৩৫·০০
☐ মস্কো	—	—	—	৪০·০০
☐ সাইবেরিয়া ও দূরপ্রাচ্য	—	—	৩০·০০***	—
☐ শান্তি ও মৈত্রী	—	৮·০০	—	২৫·০০
☐ অক্টোবর বিপ্লব	৩·৭৫	—	—	২৫·০০
☐ নানারকম	৩·৭৫	৮·০০	১৫·০০	২৫·০০

★ ৯০টি স্ট্যাম্প ★★ ৮৫টি স্ট্যাম্প ★★★ ৫৩টি স্ট্যাম্প

নাম ______

বয়স ______ স্কুল ______

বাড়ির ঠিকানা ______

সঙ্গীয় টাকা ☐ ভি পি পি অর্ডার ☐

চিনার—প্রতিদিন অসংখ্য সংগ্রাহকের জন্য অজস্র ডাকটিকিট আমদানি করে চলেছেন।

চিনার এক্সপোর্টস প্রাঃ লিঃ

রেজিঃ অফিস :

১০১ এ, সূর্য কিরণ, কস্তুরবা গান্ধী মার্গ,

নয়াদিল্লি—১১০ ০০১।

ডাকটিকিট—এর সংগ্রহ তোমাদের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বেড়ে ওঠে।

F.N/XIII/B/608

বড়গল্প

রসা রোডের মোড়ে

প্রতুলচন্দ্র গুপ্ত

আমি বললাম, "সত্যি বলছি, আমি ভূত বিশ্বাস করি না। পোড়োবাড়িতে রাত কাটাতে বল্, রাত বারোটার পর কঙ্কালীতলার শ্মশানে গিয়ে গাছের গায়ে খড়ির দাগ দিয়ে আসতে বল্, তাতেও রাজি আছি। কিন্তু তাই বলে ও রাস্তায় সন্ধ্যার সময় আমি যেতে পারব না।"

পরেশ বলল, "তোর ভয় কিসের ? কলকাতা শহর, রাস্তায় ট্রাম চলছে, বাস চলছে, উপর দিয়ে রেলগাড়ি চলে যাচ্ছে। কাছেই লেক্, সেখানে যেতে ভয়ের কী আছে ?"

"ঠিক ভয় নয়, আরও কারণ আছে। তোদের আমি ঠিক বোঝাতে পারছি না।"

"তুই খুলে না বললে কী করে বুঝব ?"

"আচ্ছা তবে তাই হোক্। প্রথম থেকেই তোদের বলছি।"

"দেশ যখন ভাগ হয়ে গেল তখন তো আমার জন্ম হয়নি ; তোদেরও হয়নি। শুনেছি বরিশালে আমাদের বাড়ি-টাড়ি ছিল, দুটো পুকুর, সুপুরিবাগান ছিল। কিন্তু আমাদের প্রায় এক বস্ত্রে চলে আসতে হল। তবু টাকা-পয়সা, গয়নাগাটি বাবা বুদ্ধি করে মামাদের কাছে আগে পাঠিয়ে দিয়েছিল। তাই আমরা টিঁকে থাকতে পেরেছি।"

"তোরা কি তখন থেকেই বেণীনন্দন স্ট্রিটে থাকিস্ ?"

"তখন থেকেই। বাবা সেই পুরনো ব্যবসা কলকাতাতে আরম্ভ করেছিলেন। আমি তো দেশের কথা জানিই না। আমি যে স্কুলে ভর্তি হলাম, সেটা দক্ষিণ কলকাতার বড় স্কুল। তবে

একটু পাগলাটে ধরনের ছিল। আমি যখন স্কুলে ভর্তি হলাম, তখন বুড়ো হেডমাস্টারমশায় রিটায়ার করেছেন। তারপর কয়েক বছর আর কেউ হেডমাস্টার হয়ে এলেন না। দু'চারজন মাস্টারমশায় পালা করে হেডমাস্টারের কাজ করতে লাগলেন। যখন ক্লাস নাইনে উঠলাম, তখন একজন নতুন হেডমাস্টার এলেন। ইনি খুব পণ্ডিত, তবে খুব বুড়ো। কানে একটু কম শোনেন, চোখেও ছানি পড়েছে, ভাল দেখতে পান না। মাস্টারমশাইরা অনেকে বললেন, তোদের ভাগ্যি ভাল উনি এসেছেন, এরকম পণ্ডিত লোক এ-তল্লাটে পাবি না। আমরা অবিশ্যি কোনও তফাত বুঝতে পারলাম না। স্কুল খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে চলতে লাগল। মাস্টারমশাইরা সবাই পড়াতে চাইতেন না। কয়েকজন অবশ্য সেরকম ছিলেন না। আবার কয়েকজন ক্লাসে এসেই ঘুমিয়ে পড়তেন কিংবা বাজে গল্প করতেন। যিনি ইংরেজি গ্রামার পড়াতেন, তিনি হাতের ছড়িটা দেওয়ালে ঠেস দিয়ে রাখতেন। তারপর চেয়ারের উপর পা তুলে বসে বলতেন, আজকের খবরের কাগজটা ভাল করে পড়বি, এডিটোরিয়ালটা আমার লেখা। বলে গলার চাদরটা চেয়ারের পিছনে ঝুলিয়ে দিয়ে ঘুমিয়ে পড়তেন। এইজন্য ভাল করে ইংরেজি শেখা হল না। আমরা কাটাকুটি খেলতে শুরু করতাম। ঘুমের ব্যাঘাত না হলে তিনি কিছু বলতেন না।

"এই সময় কালীনাথের সঙ্গে আমার ভাব হল। কালীনাথ আধময়লা কাপড় পরে স্কুলে আসত। বাড়ির অবস্থা ভাল ছিল না। বেশ ভাল অঙ্ক জানত, সংস্কৃত জানত, ভাল ফুটবল খেলত। কোনওটাই আমি পারতাম না। যিনি আমাদের সংস্কৃত পড়াতেন, পণ্ডিতমশায়, তাঁর নাম দেবকীনন্দন ভট্টাচার্য। পণ্ডিতমশাইরা সাধারণত একটু ঢিলেঢালা ভালমানুষ হন। সবাই তাঁদের ক্লাসে গণ্ডগোল করে। এই তো রেওয়াজ। আমাদের পণ্ডিতমশাই কিন্তু অন্য রকম ছিলেন। বেঁটে, মোটাসোটা চেহারা, কালো রং, বড় চাপদাড়ি, চুলও বড়-বড়, গায়ে কালো লোম। পড়ানোর চাইতে মারধোর বেশি করতেন। পড়াতেন যে ভাল তাও নয়। কিছু জিজ্ঞাসা করলে, 'এটাও বুঝলি না, বল্ কোন্খানটা বুঝিসনি,' এই বলে এমন কটমট করে তাকিয়ে থাকতেন যে, মনে হত এক্ষুনি একটা চড় কষাবেন। ছেলেরা যে তাঁকে পছন্দ করত না, সে-কথা না বললেও চলে।

"তখন কলকাতায় শীত যাব-যাব করছে। একদিন দুটোর সময় টিফিনের ছুটির পর ক্লাসে ঢুকে দেখি, কে যেন পেন্সিল দিয়ে মাস্টারমশাইদের চেয়ারের পিছনের দেওয়ালে বড় বড় করে লিখে রেখেছে 'নাকে চুলো রাক্ষস দেবকীনন্দন'। বেশ বড় বড় করে লেখা, দূর থেকেও পড়া যায়। পণ্ডিতমশাই চেয়ারে বসে সামনের বেঞ্চির দিকে তাকিয়ে বললেন, 'আজ আমাদের পাঠ্য অলুক সমাস। তোরা বাড়িতে বই দেখে এসেছিস্ তো ?' এই কথা বলতে না বলতে পাশের বেঞ্চি থেকে একটা ছেলে খুকখুক করে হেসে উঠল। তারপর পিছনের বেঞ্চিতেও মিলিয়ে যাওয়া হাসির রেখা। পণ্ডিতমশাই দেখলেন কালীনাথও হাসছে। তিনি বললেন, 'কী হয়েছে রে ?' পণ্ডিতমশাই সামনের বেঞ্চির ছেলেদের জিজ্ঞেস করবেন বলে ঘুরে দাঁড়ালেন এবং তৎক্ষণাৎ চোখে পড়ল চেয়ারের পিছনের দেওয়ালে কী সব লেখা রয়েছে। তিনি আবার কালীনাথের দিকে ফিরে তাকালেন এবং শার্টের কলার ধরে টেনে এনে বললেন, 'তুই লিখেছিস ?' কালীনাথ দেখতে রোগা হলে কী হবে, রগচটা ছিল। সে সোজা উত্তর না দিয়ে বলল, 'আপনি লিখতে দেখেছেন ?' পণ্ডিতমশাই দমলেন না, বললেন, 'তবে কে লিখেছে ?' কালীনাথ বলল, 'আমি কী করে জানব স্যার, ক্লাসের সবাইকে জিজ্ঞেস করুন।' এই উত্তরে পণ্ডিতমশায়ের ধৈর্যচ্যুতি ঘটল। তিনি আবার কলার টেনে কালীনাথকে চড় মারতে হাত তুললেন। কালীনাথ সঙ্গে সঙ্গে বলল, 'মারবেন না স্যার, হেডমাস্টারমশায়ের অনুমতি ছাড়া মারলে বেআইনি হবে।' পণ্ডিতমশায় হাত ছেড়ে দিলেন, এবং রাগে ফুঁসতে ফুঁসতে বললেন, 'আজ তোদের একদিন কি আমার একদিন।' এই বলে ক্লাস থেকে রেজিস্টার হাতে নিয়ে বেরিয়ে গেলেন।

"কালীনাথ বলল, 'হেডমাস্টারের কাছে লাগাতে গেলেন।' পাছে অন্য ক্লাসের মাস্টারমশাইরা এসে জড়ো হন, তাই ক্লাসে গোলমাল করা হল না। কাটাকুটি খেলাতেও কারুর মন নেই। এইভাবে মিনিট পনেরো কেটে গেল। এমন সময় আপিস থেকে বড় কেরানিবাবু একজন বেয়ারাকে নিয়ে ক্লাসে এলেন; বললেন, 'কালীনাথ কার নাম ? হেডমাস্টারমশায় আপিসে ডেকেছেন।' 'আজ নিশ্চয় বেত খাওয়া আছে কপালে', এই বলে কালীনাথ বেরিয়ে গেল। তারপর তাকে আর স্কুলে দেখিনি। অনেকদিন পরে জানতে পেরেছিলাম কী হয়েছিল।"

এই পর্যন্ত শুনে পরেশ বলল, "তুই তো ভূতের দিকে যাচ্ছিসই না। খালি স্কুলের গল্প করছিস্।"

"আর একটু শোন, তারপর যা খুশি বলিস।

"এরপর চার-পাঁচ বছর কেটে গেছে। আমি তখন কলেজে পড়ি। রোজ কলেজ থেকে ফিরে হাতমুখ ধুয়ে হাঁটতে বেরোতাম। রসা রোডের অবস্থা তখন তত খারাপ হয়নি। রসা রোড দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে লেকের ধার দিয়ে টালিগঞ্জের কাছে এখন যেখানে টেলিভিশনের সেণ্টার হয়েছে সেই অবধি চলে যেতাম। কাছে একটা মসজিদ আছে। সেই অবধি গিয়ে ফিরে আসতাম। যেদিন মনে হত ফিরতে দেরি হয়ে যাচ্ছে, সেদিন মাঝরাস্তায় ট্রাম চড়তে হত। তোরা তো জানিস, লেকের কাছে রসা রোড অনেক সরু ছিল। আলোও কম। সন্ধের পরে অনেকগুলো ঠেলাগাড়ি শাকসব্জি, লাউ, কুমড়ো, বাঁধাকপি, ফুলকপি, কলার পাতা এইসব বোঝাই করে ভবানীপুরের দিকে আসত। ফিরতে অনেক দেরি হবে বলে ভাবছিলাম যে, ট্রামে ফিরতে হবে। এমন সময় দুটো ঠেলাগাড়ি পাশাপাশি যাচ্ছে দেখে আমি রাস্তার দিকে সরে দাঁড়ালাম। কিছুক্ষণ থেকে মনে হচ্ছিল আমার পাশে পাশে কে যেন হেঁটে আসছে, আগে খেয়াল করিনি। যেই দাঁড়ালাম, অমনি শুনতে পেলাম, কে যেন বলল, 'কী রে, চিনতে পারলি না, আমি কালীনাথ।'

"এতদিন পরে কালীনাথকে দেখতে পেলাম। সেই রকম খয়া-খয়া চেহারা, শীতের সময় বলে গায়ে আলোয়ান। জিজ্ঞেস করলাম, 'কী করছিলি এতদিন ?' কালীনাথ কোনও জবাব দিল না। আমি আবার বললাম, 'সেদিন তোর কী হল হেডমাস্টারমশায়ের ঘরে, সে তো শোনাই হল না।' কালীনাথ বলল, 'পণ্ডিতমশায় তারপর ক্লাস নিয়েছিলেন ?' আমি বললাম, 'না। মাস দুয়েকের ছুটি নিয়ে কোথায় যেন চলে

গেলেন।' কালীনাথ সেকথা শুনে হেসে উঠল। বলল, 'তাহলে তোকে সব বলি। আমাকে তো কেরানিবাবু একেবারে হেডমাস্টারের ঘরে নিয়ে গিয়ে হাজির করলেন। হেডমাস্টারমশায় তখন বড় টেবিলের অন্যদিকে টেবিল ল্যাম্প জ্বেলে কীসব কাগজপত্র দেখছিলেন। কেরানিবাবু বললেন, এই যে স্যার, কালীনাথকে নিয়ে এসেছি। হেডমাস্টারমশায় মুখ না তুলে বললেন, কী হে, ক্লাসে কী-সব গোলমাল করেছ, বলো। এমন কাজ আর করবে না। অন্য যে দুজন মাস্টারমশায় ও পণ্ডিতমশায় বসেছিলেন, তাঁরা একসঙ্গে বলে উঠলেন, না স্যার, অপরাধ খুব গুরুতর, শাস্তি না দিলে স্কুলে ডিসিপ্লিন রাখতে পারব না। হেডমাস্টারমশায় বললেন, ও, তাহলে তো কিছু করতেই হয়। একে পাশের ঘরে নিয়ে যান। পাশের ঘরের অর্থ আমি জানি। সেখানে অ্যাসিস্ট্যাণ্ট হেডমাস্টার বসতেন। ঘরে অ্যাসিস্ট্যাণ্ট হেডমাস্টার, অন্য একজন মাস্টারমশায় ও পণ্ডিতমশায়। দুটো ঘরের মাঝখানে কাঠের পার্টিশান, উপরটা ফাঁকা, সব কথাই শোনা যায়। সেই ঘরে গেলে অ্যাসিস্ট্যাণ্ট হেডমাস্টার বললেন, দরজার দিকে পিছন করে দাঁড়াও ; হাত পাতো। আমি ডান হাত পেতে দিলাম। অ্যাসিস্ট্যাণ্ট হেডমাস্টার হাতের উপর দু'ঘা বেত মেরে বললেন, আর কখনও এরকম করবি না। আমি এত সহজে ছাড়া পাব ভাবিনি। তিনি পণ্ডিতমশায়কে বললেন, এই নিন আপনার আসামি। বোধহয় বলতে চাইলেন, যান, ক্লাসে নিয়ে যান। কিন্তু পণ্ডিতমশায় দমবার পাত্র নন। তিনি বেত তুলে বেধড়ক মারতে লাগলেন। আমি বললাম, স্যার, কাঁধে মারবেন না, ক'দিন আগে ফুটবল খেলতে গিয়ে লেগেছে, প্লাস্টার করা আছে। পণ্ডিতমশায় প্লাস্টারের উপরেই তৎক্ষণাৎ এক ঘা বসিয়ে দিলেন। খুব যে লেগেছে বলতে পারব না, কিন্তু আমার মাথায় খুন চেপে গেল। পণ্ডিতমশায় বললেন, এবার কেমন মজা। আমি বললাম, মজা দেখাচ্ছি। বলেই ঝাঁপিয়ে পড়লাম তাঁর উপরে। অন্য মাস্টারমশায় দুজন হাঁ করে চেয়ে রইলেন। এরকম ঘটনা যে ঘটতে পারে, তা তাঁরা ভাবতে পারছিলেন না। আমার বেতের শব্দ পার্টিশানের ওপাশে হেডমাস্টারমশায়ের কানে গিয়েছিল, কিন্তু কে যে কাকে মারছে, ওদিক থেকে বুঝতে পারছিলেন না। তিনি বললেন, ঢের হয়েছে, আর না, শেষকালে হাঙ্গামা-হুজ্জুতে পড়তে হবে। এই কথা শুনে আমি শেষ এক ঘা মেরে নিয়ে বেত হাতে বেরিয়ে পড়লাম। পণ্ডিতমশায়ের চেঁচামেচিতে দু'একজন কেরানিবাবু, একজন পিওন ঘরের সামনে উঁকিঝুঁকি মারছিল। বেত হাতে আমার মূর্তি দেখে তারা সুড়সুড় করে সরে গেল। সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে দেখলাম স্কুলের খোঁড়া দারোয়ান উপরে যাবে কি না ভাবছে। তার তো পা খোঁড়া, সে ছুটেও আমাকে ধরতে পারবে না। স্কুলের সামনে যে ফিরিওয়ালা বড় ডালায় করে লজেন্স, চকোলেট, বাদাম, হজমিগুলি এই সব বিক্রি করে, সেও উঠে দাঁড়িয়েছিল। স্কুল থেকে বেরোবার সময় তার ডালাটা উল্টে দিলাম, সবকিছু ধুলোয় পড়ে লুটোপুটি খেতে লাগল।'

"কালীনাথ একটুক্ষণ চুপ করে রইল। তারপর আবার বলতে লাগল তার কাহিনী। 'কিছুক্ষণ রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়ালাম। তারপরে হরিশ পার্কের এক কোণে বসে থাকলাম। তখন বাতাসে ঠাণ্ডা ভাব আছে। হঠাৎ মনে হল, এখানে বসে থাকা ঠিক হবে না। অ্যাসিস্ট্যাণ্ট হেডমাস্টার যে-রকম লোক, হয়তো পুলিশে খবর দিয়েছেন। সেখান থেকে বেরিয়ে আস্তে আস্তে বাড়িতে গিয়ে পৌঁছলাম। পিসিমা বললেন, আজ এত তাড়াতাড়ি ফিরে এলি ? আমি বললাম, একজন মাস্টারমশায় মারা গিয়েছেন ; ছুটি হয়ে গেল। পিসিমা বললেন, কিন্তু তোকে কী রকম দেখাচ্ছে ; জ্বর এল নাকি ? আমি বললাম, জ্বর কেন হতে যাবে, একটু ঠাণ্ডা লেগেছে। পিসিমার মেজাজ কখনওই ঠাণ্ডা থাকে না। তিনি বললেন, ঠাণ্ডা লাগাতে কে বলেছে তোমাকে, আমি এখন সেবা করে মরি আর কি। অসুখ হলে সেবা করবেন, পিসিমা

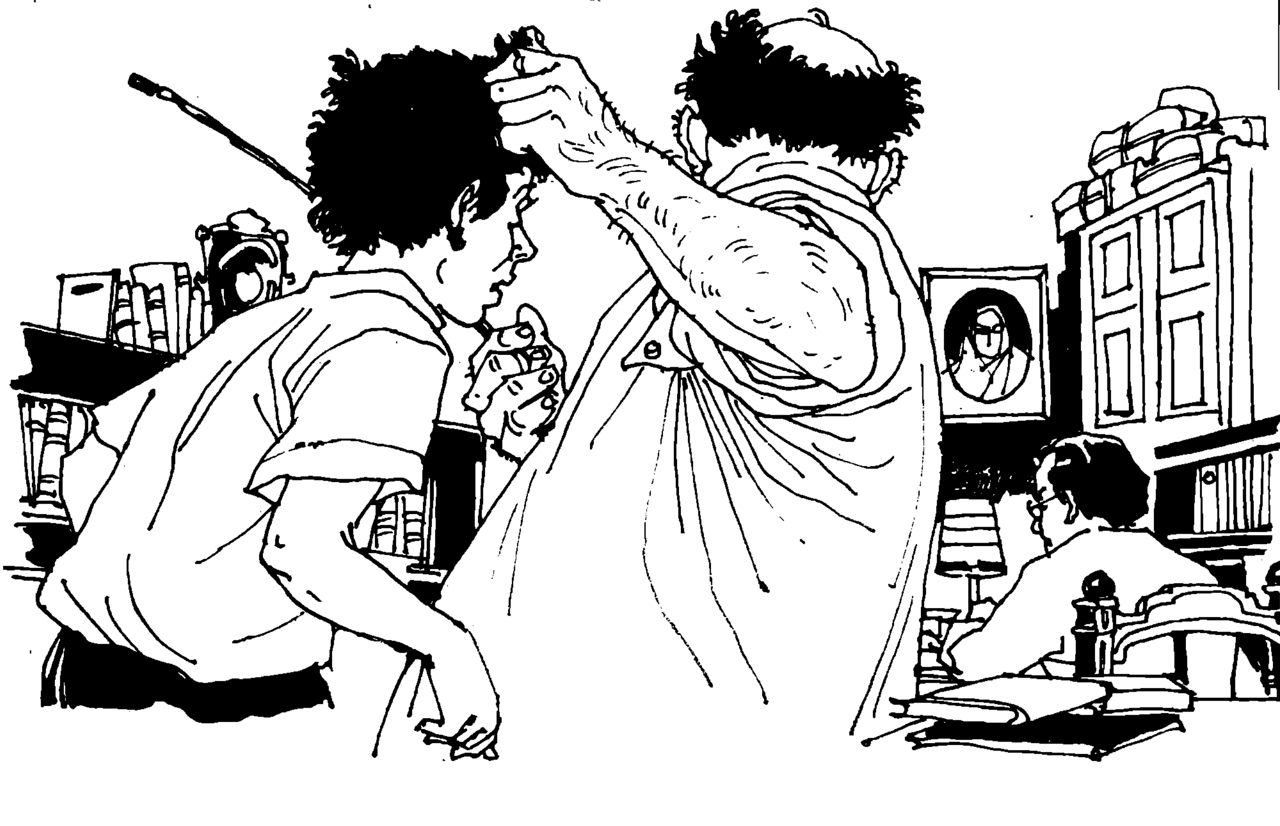

আচ্ছা, কাচবার পর আপনার কাপড় জামা ঠিক ধবধবে সাদা হয় কি?

"আমি তো সেরা ডিটারজেন্টে পরিষ্কার করেই কাচি... কিন্তু ধবধবে সাদা কি হয়?"

"এ ব্যাপারে আমি কিন্তু সামান্য একটু বেশি নজর দিই।

রবিনে ডুবিয়ে ধবধবে সাদা করে নিই।"

আপনার মতো আমিও বাজারের সেরা ডিটারজেন্ট দিয়েই কাপড় কাচি–কিন্তু শুধু ডিটারজেন্টে ঠিক যেন ধবধবে সাদা হয় না।

তাই তো **রবিন ফেব্রিক হোয়াইটনারে** একবার ডুবিয়ে সত্যিকারের সাদা করে কাচা শুরু করলাম।

রবিন কাপড় চোপড় ধবধবে সাদা করার উপাদান। এতে তেমন কোন ক্ষতিকারক রাসায়নিক দ্রব্য নেই যা আপনার কাপড়ের রং জ্বলিয়ে ক্ষতি করতে পারে।

রোজ কাপড় ধোবার পর রবিনে ডোবালে দেখবেন দিনে দিনে ধবধবে ভাবটা বেড়েই চলেছে। আর আপনার কাপড় জামা বা হাতেরও কোন ক্ষতি হবে না।

জামা কাপড় যেমন কাচেন, তেমনিই কাচুন। শুধু কাচবার পর একবার রবিন ফেব্রিক হোয়াইটনারে ডুবিয়ে নিন। দেখবেন কি ধবধবে সাদা হয়ে গেল। আর পাঁচজনে দেখলে ভাববে, বাঃ! কাচবার পর কি যত্ন নিয়ে সাদা করা।

Dip-it-in Robin
for extra whiteness.
Super safe for clothes.

এখন পাবেন সুবিধাজনক স্যাশেতে!

রবিন
ফেব্রিক হোয়াইটনার

কাপড় জামা একবার ডোবালেই ধবধবে সাদা, সম্পূর্ণ নিরাপদ!

CLARION C-ROR-1

অবশ্য সে-রকম লোকই ছিলেন না। যা হোক, আর কথা বাড়ালাম না ; ঘরে গিয়ে শুয়ে রইলাম। পরদিন সকালে দেখলাম বেশ জ্বর হয়েছে ; সর্বাঙ্গে ব্যথা। সেই অবস্থায় খোঁড়াতে খোঁড়াতে ঠিক সময়ে বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেলাম। রাস্তায় রাস্তায় ঘুরবার অবস্থা ছিল না। দুপুরবেলায় একটা পার্কে বসে থাকলাম, তারপর আবার সাড়ে চারটের সময় বাড়ি। বাড়ি ফিরে দেখি সব ফাঁস হয়ে গিয়েছে। পিসেমশাই যেখানে তাস খেলতেন সেখানে আমাদের এক মাস্টারমশাইয়ের ভাইও আসতেন। ব্রাজারের সময় তিনি ঘটনাটা খুব রং দিয়ে গল্প করেছেন। পিসেমশাই বাড়িতে ফিরেই চেঁচাতে লাগলেন, এই তোমার স্কুলে গিয়ে লেখাপড়া শেখা ? কালই তুমি এ বাড়ি থেকে দুর হবে। পড়াশুনোর খরচ আমি যোগাতে পারব না। তোর জন্য বংশের নাম ডুবল। ডুববার অবশ্য বেশি কিছু ছিল না। পিসেমশায়ের ছোট ভাই নেশা করে নালায় ডুবে মরেছিলেন। সে-কথা তো বলা যায় না। পড়ার খরচও বেশি দিতে হত না। স্কুলের মাইনে ছিল চার টাকা। তার উপরে আমি ছিলাম হাফ ফ্রি। সে-সব কথা কে বলে ? পিসেমশায় বললেন, আর স্কুলে গিয়ে কাজ নেই, কোনও লাইনে ঢুকে পড়ো। লাইনে ঢোকা হল না, কিন্তু পাড়ার রামতারণবাবু আমাকে ডেকে পাঠালেন। রামতারণবাবুকে আমি কখনও পছন্দ করতাম না। নোংরা দাড়ি, কখনও স্নান করতেন না, দেখেই দুষ্ট লোক বলে মনে হত। রামতারণবাবু আমাকে বললেন, তোকে তো স্কুল থেকে তাড়িয়ে দিয়েছে, তা হোক, তুই আমার নাতিটাকে অঙ্ক কষাবি আর ইংরেজি পড়াবি ! তুই তো অঙ্কটা ভাল জানিস শুনেছি। রোজ সকালে সাতটার সময় আসবি, নটা অবধি পড়াবি, ফাঁকি দিবি না। ছ'মাস পরে যখন হাফ-ইয়ার্লি পরীক্ষা হবে, তখন যদি পাশ করে, মাইনে ঠিক হবে। তা বলে এখন তুই কিছু পাবি না, তা নয়। রোজ সকালে এখানে জলখাবার খাবি। জলখাবার মানে দুটো আটার রুটি একটু গুড়, আর না হলে রুটির সঙ্গে একটু পোড়া বেগুনভাজা। ভেবেছিলাম মাইনে যখন নেই, তখন পেট ভরে খেয়ে নেব। কিন্তু রুটি তো গোনাগুনতি। দু' মাস পরে বুঝতে পারলাম এরকম ছাত্রকে পাশ করানো আমার কর্ম নয়। আগেই ছেড়ে দিতাম, কিন্তু সকালে রুটি-গুড়ের অসুবিধে হবে, তাই ছাড়তে পারলাম না। মার্চ মাসের শেষে যখন ছাড়ব-ছাড়ব করছি, তখন বিপিনমুদি আমাকে ডেকে পাঠাল। আমাদের বাড়ি থেকে সিকি মাইল দূরে। তার দোকান বেশ বড়। সবাই বলে যে খুব ওস্তাদ ব্যবসায়ী। সকালে পড়াবার সময় মনে হত, রুটির সঙ্গে আর একটু গুড় পেলে ভাল হত। এর দোকানে দেখলাম অন্তত পঁচিশ নাগরি গুড়, চাল, ডাল, চিনি, আটা, মশলা। সরষের তেলও আছে। একটা টিনের গায়ে লেখা, খাঁটি সরিষার তৈল, আর একটা টিনের গায়ে রয়েছে আগমার্কা। দুটো একই জিনিস, শুধু দামের তফাত। স্লেট, পেন্সিল খাতা, কাগজ, কালি। বেশ বড় দোকান।'

"আবার একটু থামল কালীনাথ। তারপরে ফের বলতে লাগল তার কথা। 'বিপিন আমাকে বলল, তুই তো বোকা নোস্। দুদিন বোস, সব শিখে যাবি। কাল থেকেই আয়। পরদিনই মাস্টারি ছেড়ে দিয়ে সকাল থেকে দোকানে এসে বসতে লাগলাম। সকালের রুটি-গুড় বন্ধ হয়ে গেল। বিপিন বলেছিল, সে এখন তিরিশ টাকা করে মাইনে দেবে। প্রথম দিন আমাকে তিনটে টাকা দিয়ে বলল, এটা এখন রাখ, পরে মাইনের থেকে কেটে নেব। সাবান কিনে জামাকাপড়গুলো ভাল করে কেচে নিস্। অনেক খদ্দের আবার এত ময়লা জামাকাপড় পছন্দ করে না। কাজ তেমন কঠিন নয়, সাতদিনে পাকা দোকানদার হয়ে গেলাম। একটা জিনিস চোখে পড়তে লাগল। বিপিন ওজনে খদ্দেরদের ঠকাচ্ছে। এমন করে তেল মাপছে যে, সব সময় কম দিচ্ছে, কিন্তু ধরা যাচ্ছে না। আর বাকি খদ্দেরের খাতায় তো খুব মজা। যেখানে একটাকা তেরো পয়সা হচ্ছে, সেখানে একটাকা কুড়ি পয়সা লিখে রাখছে। তাছাড়া, সবাই তো এক সঙ্গে পুরো টাকা দিতেও পারে না। কিছুদিন পরে, তখন দোকানের সামনে ভিড় একটু কমেছে, আমি বিপিনকে বললাম, বিপিনদা একটু কথা আছে। এটা কি ভাল হচ্ছে ? বিপিন বলল, কি বলছিস ? আমি তো বলেইছি, মাসের শেষে টাকা পাবি। আমি বললাম, তা নয়, এই যে রোজ খদ্দের ঠকাচ্ছ, তা কি ঠিক হচ্ছে ? বিপিন চোখ পাকিয়ে বলল, কী রকম ? আমি বললাম, এই যে পাষাণ ঠিক করে ধরো না, তেল মাপবার সময় কারচুপি করো, ভালমানুষ খদ্দের দেখলে তাকে সব সময় ওজনে কম দাও, এটা কি ভাল ? বিপিন দাঁত খিচিয়ে বলল, কি. আমার যুধিষ্ঠির রে, তোর হাতে দোকান থাকলে তো একদিনেই তুলে দিতিস্। আমি বললাম, তা হোক, অধর্ম করতে পারব না। বিপিন রেগে বলল, যখন মাস্টার ঠেঙিয়েছিলি তখন ধর্মের কথা মনে ছিল না ? আমি বললাম, তা যাই বলো, আমাকে দিয়ে এ-কাজ হবে না। বিপিন বলল, বেরিয়ে যা, ওবেলা থেকে আর আসবি না। আমি বললাম, এই কথা ? তবে আমার এই ক'দিনের মাইনে চুকিয়ে দাও। বিপিন বলল, মাইনে আবার কোথায় ? তোকে তো কাজ শেখাব বলে নিয়েছিলাম। আমি বললাম, তবে রে, এই বলে গুড়ের নাগরিতে লাথি মারতে যাচ্ছিলাম। কিন্তু রাস্তার দুটো লোক আমার হাত ধরে ফেলল, আর বিপিন

ULKA-HCG-BF-10-85-BENG

সেই ফাঁকে আমার গালে একটা চড় কষিয়ে দিল। বলল, ভাগ্ এখান থেকে। তখন রাস্তার সামনে লোক জড়ো হয়ে গিয়েছে। বিপিন তাদের শুনিয়ে-শুনিয়ে বলতে লাগল, দেখুন ছোঁড়ার কাণ্ড একবার। বাড়িতে খেতে পায় না বলে এখানে নিয়ে এসেছিলাম কাজ শেখাতে। রোজ কিশমিশ, লবঙ্গ, দারচিনি চুরি করে পালাত, আজ হাতে-নাতে ধরেছি। একজন বাঁধা খদ্দেরও সেখানে দাঁড়িয়ে ছিল, বাকিতে জিনিস কিনত। সে বলল, দূর করে দাও না কেন বিপিনবাবু, এই সব লোকের জন্যই তো দোকানের বদনাম হয়। বিপিন আমাকে ঘাড়ধাক্কা দিয়ে বের করে দিল। আমার তখন তিন সপ্তাহ কাজ হয়েছে। বললাম, আমার পাওনা চুকিয়ে দাও, চলে যাচ্ছি। বিপিন বাক্স খুলে পাঁচটা এক টাকার নোট দলা পাকিয়ে আমার দিকে ছুঁড়ে দিয়ে বলল, যা, তোর পাওনার চাইতে বেশিই দিলাম। আর এদিকে মাড়াবি না।

'অনেকদিন পরে হাতে পাঁচটা টাকা এল। আমি পাশের রাস্তায় একটা চায়ের দোকানে গিয়ে বসলাম। মনে হল নিজের পয়সায় এবারে এক পেয়ালা চা ও লেড়ো বিস্কুট খাই। কেবল গিয়ে বসেছি, দোকানিকে তখনও ডাকিনি, এমন সময় একজন লোক ত্রিশ-পঁয়ত্রিশ বছর বয়স, ধপধপে ট্রাউজার, ছাই রঙের বুশশার্ট, দাড়ি-গোঁফ-কামানো, আমাকে বলল, এই ছোঁড়া, তোর নাম কী রে? তুই বিপনেটাকে আচ্ছা শুনিয়েছিস। ছোঁড়া শুনে একটু রেগে গিয়েছিলাম, কিন্তু পরের কথায় সেই রাগ জল হয়ে গেল। লোকটা বলল, আসবার সময় ওর একটা কিছু ভেঙে দিয়ে এলি না কেন? এই বলে আমাকে কিছু না বলে দোকানিকে বললে, ওহে মতি, এদিকে এসো। মতি উত্তরে বলল, আসছি শিবুদা। দোকানি এসে দাঁড়ালে লোকটা তাকে বলল, দুটো ডবল ডিমের মামলেট, দুটো মুচমুচে টোস্ট আর দুটো কেক, যেন বড় স্লাইস হয়। শেষ হলে দু' গ্লাস চা। দোকানি বলল, এক্ষুনি দিচ্ছি শিবুদা। তখন লোকটা বলল, তাড়াতাড়ি খেয়ে নে, কাজ আছে। আমি ভয়ে ভয়ে নাম জিজ্ঞেস করলাম। লোকটা বলল, সবাই শিবুদা বলে, তুইও তাই বলবি। ভীষণ খিদে ছিল, তাই খাবারগুলো কখন শেষ হয়ে গেল। খুব বেশি চিনি দেওয়া গরম চাও মন্দ লাগল না। বুঝলাম, এসব শিবুদাকে খাতির করার জন্য। তা না হলে চায়ে এত চিনি থাকেই না। শিবুদা খেয়ে উঠে দোকানিকে বলল, লিখে রাখিস। তারপর আমাকে বলল, বাইরে চল্ কথা আছে। বাইরে আমরা গিয়ে একটা পেট্রোল পাম্পের কাছে দাঁড়ালাম। শিবুদা বলল, চাকরি করবি? আমি বললাম, মাইনে কত? শিবুদা বলল, যা ভাবছিস তার চেয়ে অনেক বেশি। কাজটাও খুব সহজ। আমি বললাম, তা হলে সে-কাজ তারা আমাকে দেবে কেন? শিবুদা বলল, বেশি কথা বলবি না, শুনে যা। সপ্তাহে একদিন, কোন্দিন, তোকে আমি জানিয়ে দেব। রসা রোডের মোড়ে যেখানে রেললাইন রাস্তার উপর দিয়ে চলে গেছে, সেখানে সন্ধে ছ'টার সময় দাঁড়িয়ে থাকবি; তোর কিছু করতে হবে না। একটা ঠেলাগাড়ি থেকে একজন লোক এসে তোর কাছে দাঁড়াবে। তুই বলবি শিবুদা, সেও বলবে শিবুদা। তোকে একটা পুঁটলি দেবে। সেটা নিয়ে তালতলা লেনে, আমি ঠিকানা দিয়ে দেব, একটা বাড়িতে পৌঁছে দিবি। সেখানে গিয়ে বলবি, শিবুদা পাঠিয়েছে। তোকে আর কিছু করতে হবে না।

আমি ঠেলার কাছেই থাকব; কিন্তু তুই আমাকে দেখতে পাবি না। আমি বললাম, পুঁটলিতে কী থাকবে? শিবুদা রেগে বলল, তা দিয়ে তোর দরকার কী? পুঁটলি কখনও খোলার চেষ্টা করবি না। আমি বললাম, তাই কি করি? শিবুদা বলল, মনে রাখবি, তোর উপর সব সময় নজর রাখছি। আমার কাজটার উপর কেমন লোভ হল। শিবুদা তারপর আমাকে জগুবাবুর বাজারে নিয়ে গিয়ে দুটো প্যান্ট, দুটো শার্ট ও একজোড়া চটি কিনে দিল। একটা সেলুনে নিয়ে গিয়ে চুল ছাঁটিয়ে দিল। বলল, বেশ ফিটফাট থাকবি। রোজ স্নান করবি। আর তারপর আমার পকেটে কুড়িটা টাকা ভরে দিল।

'একদিনে পঁচিশ টাকা রোজগার। সেটা শনিবার ছিল। মঙ্গলবার দুপুরে আচ্ছা করে পরোটা-মাংস খেয়ে সন্ধ্যাবেলা গিয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম। কয়েকটা ঠেলাগাড়ি চলে যাবার পরে দুটো ঠেলা একসঙ্গে এল। একটা লোক এতক্ষণ ঠেলছিল, সে বেরিয়ে এসে আমাকে বলল, শিবুদা। আমিও বললাম, শিবুদা। তখন সে আমার হাতে একটা পুঁটলি দিয়ে আবার ঠেলা ঠেলতে লাগল। আমি একটা বাসে চেপে এসপ্লানেড এলাম। সেখান থেকে একটা রিকশা নিয়ে তালতলা লেনের সেই বাড়ির সামনে এসে দাঁড়ালাম। শিবুদা সেই ভাবেই যেতে বলেছিল। পুঁটলিটা দেখতে ছোট, কিন্তু বেশ ভারী। রিকশা না নিলে অসুবিধে হত। তালতলা লেনের মোড়ে গিয়ে রিকশা ছেড়ে দিলাম। প্রথমে ভেবেছিলাম ছোট বাড়ি হয়তো হবে। দরজা বন্ধ ছিল, সেখানে গিয়ে বেল টিপলাম। দরজা খুলে একটা লোক বেরিয়ে এল। তাকে বললাম, শিবুদা পাঠিয়েছে। সে আমাকে বলল, ভেতরে এসো। ভিতরে গেলাম, দেখলাম বড় বসবার ঘর, কিন্তু লোকটা আমাকে বসতে বলল না। শুধু বলল, পুঁটলিটা দাও। বলে ভিতরে চলে গেল। মিনিট দশেক পরে হাতে একটা খাম নিয়ে এল। আমাকে দিয়ে বলল, এটা তোমার, রাস্তায় গিয়ে খুলো। রাস্তায় গিয়ে আলোর ধারে খামটা খুললাম। ভিতরে পাঁচটা দশ টাকার নোট। তখনও

কিছু মনে হয়নি। এত সহজে পঞ্চাশটা টাকা, তার মানে মাসে দুশো টাকা। শিবুদা ঠিকই বলেছিল, অত টাকা আমি ভাবতে পারব না। পরের বার অর্থাৎ বৃহস্পতিবার আবার এই জিনিস হল। তৃতীয় সপ্তাহে শনিবার, সেদিনও ঠিক এইরকম। শনিবার সকালে শিবুদার সঙ্গে দেখা হল হালদারপাড়া লেনে। শিবুদা ডেকে কথা বলেছিল। বলল, লেগে থাক, তোর নামে মাকে পুজো দিয়ে এলাম। আসছে মাস থেকে তোর মাইনে একটু বাড়িয়ে দেব ভাবছি। প্রত্যেকবার পঁচাত্তর টাকা করে পাবি। এই রকম মাসখানেক আরও গেল। দু সপ্তাহ বাদে একদিন সন্ধ্যায় ওই রকম পুঁটলি নিয়ে যাচ্ছি, বাসে একটা লোক, মনে হল মুখ-চেনা, আগেও দেখেছি। আমার পাশের লোকটি উঠে যেতেই সে আমার পাশে এসে বসল। আমার ঠিক ভাল লাগল না। জগুবাবুর বাজার আসতেই আমি তাড়াতাড়ি নেমে গেলাম। আমি একটা দু' নম্বর বাসে লাফ দিয়ে উঠলাম। ধর্মতলায় নেমে সেখান থেকে রিকশা ধরলাম। পরের সপ্তাহে আর রাস্তায় এসে দাঁড়ালাম না। তখন আমি ভবানী সিনেমার কাছে প্রায় একটা পোড়োবাড়িতে থাকি। ভাড়া দিতে হয় না। আলো নেই, কলের জলও নেই, কিন্তু তাতে আমার এমন কী ক্ষতি। শিবুদাকে বলতেই হত কোথায় থাকি। একটু রাতে শিবুদা এসে উপস্থিত হল। রেগে বলল, আজ গেলি না যে, অসুখ করেছে ? আমাকে জানালি না কেন ? আমি বললাম, না শিবুদা, এ-লাইন আমি ছেড়ে দিয়েছি। শিবুদা বলল, ছাড়ব বললেই কি ছাড়া যায়। তুই বোধহয় জানিস না, তোর মাইনে দু'মাস পর থেকে একশো টাকা করে দেবে। আমি চুপ করে শুনলাম। লোভ যে একবারে হয়নি তা নয়।

'কিন্তু সকালে দিনের আলোয় ব্যাপারটা ভাল করে ভেবে দেখলাম। ও লোকটা কে, যে সেদিন বাসে উঠে আমার পাশে বসেছিল ? ঠিক করলাম এদের সঙ্গে কাজ করা ভাল হচ্ছে না, ছেড়েই দিই। হাতে তখনও বেশ কয়েকটা টাকা রয়েছে। নইলে এ-জোর পেতাম না। কিন্তু তার আগে আস্তানা বদলানো দরকার। তখন টালিগঞ্জের ওদিকে অনেক বাড়ি ভাঙা আরম্ভ হয়েছে। কিছুদিন গা-ঢাকা দেওয়া কঠিন হবে না। উত্তরপাড়া, রিষড়ে, কিংবা অ্যাঙ্গাসের কাছে কোনও কলোনিতে কিছুদিন গা-ঢাকা দেওয়া যাবে। সেই রাত্তিরেই সেই আস্তানা ছেড়ে আর-একটা পোড়োবাড়িতে ঢুকলাম। দেওয়ালে শ্যাওলা পড়ে গেছে। দরজায় একটা তালা লাগানো, কিন্তু চাবি দেওয়া নেই। সে-রাত্রি সেখানেই কাটাব ভাবলাম। পুরো রাত কাটানো গেল না। শেষ রাত থেকে চারদিকে চ্যাঁচামেচি, পটকার শব্দ। বুঝলাম দুই দলে শক্তি পরীক্ষা হচ্ছে। একটু পরে বোমা পড়তে আরম্ভ করল। আমি ভাবলাম, এইখানে খাঁচার ইঁদুরের মতো মরে থাকতে হবে। বাড়ির পিছনে অনেকগুলো পেয়ারাগাছ ছিল। একেবারে ঘুরঘুট্টি অন্ধকার। ভাবলাম একটা গাছে উঠে দেখি শব্দটা কোন্ দিক থেকে আসছে। যে গাছটা ধরেছিলাম, তার ডাল পলকা, অন্ধকারে টের পাইনি। হঠাৎ হাত আলগা হয়ে গেল, নীচে পড়ে গেলাম। নীচে ঝোপঝাড় আর বড়-বড় ঘাস, খুব লাগেনি। শব্দটা ক্রমশ কাছে আসতে লাগল। ভাবলাম এখানে আর দাঁড়িয়ে থাকা নয়। যা থাক কপালে, এই বলে এক ছুটে রাস্তায় বেরিয়ে উত্তর দিকে ছুটতে লাগলাম। রেললাইনের উপরে চারদিকে অনেক বস্তি হয়েছে। ভাবলাম একটা খালি ঝুপড়ি যদি পাই, তার মধ্যে গিয়ে শুয়ে থাকব। কিন্তু ঝুপড়ি অবধি পৌঁছতে পারলাম না। খানিকটা উপরে উঠেছি, এমন সময় মোটা গলায় কে যেন চেঁচিয়ে বলল, কে যায় ? মাটিতে টান হয়ে শুয়ে রইলাম। তারপর আর একটা লোক বেরিয়ে এসে মোটা গলার লোকটার পাশে দাঁড়িয়ে বলল, নিধের দলের লোক বলে মনে হচ্ছে, রেখে কাজ নেই, সাবাড় করে দেওয়া যাক্। এই বলে আমার চারদিকে পেটো ছুঁড়তে লাগল। দু'তিনটে আমার কাছাকাছি পড়ল। তারপর একটা কোথাও লেগে থাকবে, আমি বুঝতে পারলাম না। পাশে কোথাও একটা গর্ত কাটা থাকবে, বুঝতে পারলাম গড়িয়ে গড়িয়ে তার মধ্যে পড়ে গেলাম। পরদিন সকালে মনে হল, বোধহয় শেষরাত্রে বৃষ্টি হয়েছিল। একটা ব্যাঙ আমার কপালের উপরে বসে আছে। আগে হলে কীরকম খারাপ লাগত। তখন কিছু মনে হল না। ব্যাঙটা একটু পরে লাফ দিয়ে চলে গেল। আমার মন থেকে তখনও ভয় যায়নি। উঠে দাঁড়াবার চেষ্টা করলাম। প্রথমটা পারলাম না। নিজের মনে বললাম, কিছুই তো বুঝতে পারছি না। এত হালকা লাগছে কেন ? কতদিন হল তাও এখন আমার হিসেব নেই। একটা কথা মনে হল, সকালে উঠতেই তো আমার খিদে পেত, সেদিন কিছুই হল না। তারপর সমস্ত দিন রাস্তার ধারে বসে রইলাম। মনে হল আমাকে কেউ দেখেও দেখছে না। তারপর যখন সন্ধে হল, তখনও সেখানে বসে আছি। এমন সময় দেখলাম, তুই একটা ঠেলাগাড়ির সঙ্গে দক্ষিণ দিক থেকে আসছিস। তোকে ইশারা করলাম, তুই দেখতে পেলি না। পরের দিন, তার পরের দিন দেখলাম, তুই রোজই এ-সময় বেড়িয়ে ফিরিস। তোর সঙ্গে চলতে আরম্ভ করলাম। তুই একটু অন্যমনস্ক ছিলি। তোর সঙ্গে কথা বলতে তুই কেমন চমকে উঠলি। এতদিন পরে দেখা হতেই পারে।'

"আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'কালী, তুই আজকাল থাকিস কোথায় ? তোর পিসিমারা আছেন ?' কালী কোনও জবাব না দিয়ে একটু হাসল। এমন সময় একটা বাস এসে দাঁড়াল। কালীকে বললাম, 'আমার সঙ্গে চল্‌না, বাড়ি গিয়ে শুনব তোর গল্প।' আমি লাফ দিয়ে বাসে উঠলাম। কালী নীচে দাঁড়িয়ে। আমি হাত বাড়িয়ে কালীর হাতটা ধরে তুলতে চাইলাম, কিন্তু আমার হাত কালীর হাতের ভিতর দিয়ে গলে গেল। আমি 'কালী কালী' বলে ডাকতে লাগলাম। কালীর মুখটা কেমন বদলে গেল। বড় কাচের উপর জল পড়লে জলটা কীরকম ছড়িয়ে পড়ে, সবই তেরচা দেখায়। মনে হল, কালীর মুখটাও সেইরকম বদলে গেল। কালী যেন তাকে জোর করে ধরে রাখবার চেষ্টা করছে। এরপর বাসটা আবার ঝাঁকুনি দিয়ে থামল, সামনে একটা ট্রাক। দেখলাম কালী শেষ পর্যন্ত নিজেকে ধরে রাখতে পারল না, কীরকম জলের মত মিলিয়ে গেল। কালীর আলোয়ানটা কিছুক্ষণ পড়ে ছিল রাস্তায়, তারপর সেটাও আস্তে-আস্তে মিলিয়ে গেল।

"এইবার তোরা বুঝবি আমি কেন ও রাস্তায় যেতে চাইনি।"

অসিত বলল, "সে কী রে, তোর মুখ যে একেবারে সাদা হয়ে গিয়েছে। চল্ তোকে বাড়ি অবধি পৌঁছে দিয়ে আসি।"

ছবি : সুব্রত গঙ্গোপাধ্যায়

নীলকান্তমণি-রহস্য

সার আর্থার কোনান ডয়েল

আগে যা ঘটেছে : কাঁধে মরা-হাঁস ঝুলিয়ে যে লোকটা হাঁটছিল, গুণ্ডারা তাকে আক্রমণ করতে সে লাঠি ঘোরাতে থাকে, ফলে এক দোকানের কাচ ভেঙে যায়। পুলিশ কমিশনার তাকে সাহায্য করতে গেলে সে টুপি ও হাঁস ফেলে চম্পট দেয়। পুলিশ কমিশনারের বাড়িতে হাঁসটা কাটতে তার পেট থেকে যা বেরোয়, তা দেখে শার্লক হোম্‌স বলেন, "এ হল দারুণ দামি ব্লু-কারবাঙ্কল হিরা। কসমোপলিটান হোটেল থেকে চুরি গিয়েছে।" চুরির দায়ে ধরা হয়েছিল মিস্ত্রি জন হর্নারকে। হাঁস পাওয়া গেছে বলে খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন দিতে যে-লোকটি এসে হোমসের সঙ্গে দেখা করে, তার নাম হেনরি বেকার। তার হাঁসটা খেয়ে ফেলা হয়েছে শুনে লোকটা দুঃখিত নয়, তার বদলে আর-একটা হাঁস পেয়েই সে খুশি। লোকটা বলে, তার ক্লাবে প্রতি সপ্তাহে কয়েক পেনি জমা রাখলেই বড়দিনের সময় সেখান থেকে একটা হাঁস উপহার পাওয়া যায়; সেই হাঁস নিয়েই সে ফিরছিল। বোঝা যায়, লোকটা হিরের ব্যাপার জানে না। তার ক্লাবে খোঁজ করে জানা যায়, হাঁস কেনা হয়েছিল ব্রেকেনরিজের দোকান থেকে। ব্রেকেনরিজ জানায়, সে ব্রিকস্টন রোডের মিসেস ওকশটের কাছ থেকে চব্বিশটা হাঁস কিনেছিল। হোম্‌স যখন দোকান থেকে বেরিয়ে আসেন, তখন দেখা যায়, একটা লোক ব্রেকেনরিজকে বলছে যে, ওই চব্বিশটা হাঁসের একটা ছিল তার। হোম্‌স তাকে এ-ব্যাপারে জিজ্ঞেস করতেই সে ঘাবড়ে যায়। তারপর ...

হোম্‌স খুব মিষ্টি করে বললে, "মাফ করবেন, একটু আগে ওই দোকানদারের সঙ্গে আপনার যে কথা হচ্ছিল, তা আমার কানে এসেছে। আমার মনে হয়, এ ব্যাপারে আমি হয়তো আপনাকে কিছু সাহায্য করতে পারি।" লোকটা তাতে আরও ঘাবড়ে গিয়ে বলে, "আপনি ... কে আপনি? এ ব্যাপারে আপনি কী জানেন?" হোমস আবারও মিষ্টি করে বলে, "আমার নাম শার্লক হোম্‌স। অন্যেরা যা জানে না, সেই সব খবর জানাই আমার পেশা।"

"কিন্তু এ-ব্যাপারের কোনও কিছু তো আপনার জানবার কথা নয়।"

"ভুল বুঝবেন না। এ-ব্যাপারের আগাগোড়া সবই আমার জানা। যে হাঁসগুলো ব্রিকস্টন রোডের মিসেস ওকশট ব্রেকেনরিজকে বিক্রি করেছিল, যেগুলো ব্রেকেনরিজ আবার আলফা রেস্টুর‍্যান্টের মালিককে বিক্রি করেছিল, আবার সেগুলো তার ক্লাবের মেম্বারদের মধ্যে বিলি করেছিল, যাদের মধ্যে একজন হল মিঃ হেনরি বেকার, সেই হাঁসগুলোর হদিস আপনি জানতে চাইছেন, তাই নয়?"

"আঃ হা! আমি মনে মনে বোধ হয় আপনাকেই খুঁজছিলুম। আপনাকে বলে বোঝাতে পারব না যে, এ-ব্যাপারটা আমার পক্ষে কী ভীষণ জরুরি। জীবন-মরণ সমস্যাও বলতে পারেন।"

একটা ভাড়া গাড়ি সেখান থেকে যাচ্ছিল। শার্লক হোম্‌স গাড়িটাকে ডাকলে।

"তা হলে চলুন কোথাও একটু আরাম করে বসে সমস্ত ব্যাপারটা আলোচনা করা যাক। এই দারুণ ঠাণ্ডায় রাস্তায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কথা বলার কোনও মানে হয় না। তবে সবার আগে আপনার পরিচয়টা জানতে পারলে ভাল হত।"

একটু থতমত খেয়ে লোকটি বললে, "আমার নাম জন রবিনসন।"

শার্লক হোম্‌স একটু হেসে বললে, "না, না, আপনার আসল নামটা বলুন। যিনি নিজের আসল পরিচয় গোপন রাখতে চান, তাঁর সঙ্গে কাজ করে সুখ নেই।"

লোকটির মুখ লজ্জায় লাল হয়ে গেল। "আমার নাম জেমস রাইডার।"

"ভাল, ভাল। হোটেল কসমোপলিটানের একজন কর্মচারী। আচ্ছা চলুন এখন গাড়িতে ওঠা যাক। আপনি যা যা জানতে চান আমার মনে হয় সে সব খবরই আমি দিতে পারব।"

রাইডার একবার আমার আর একবার হোম্‌সের মুখের দিকে তাকাতে লাগলে। তার মুখ দেখে আমার মনে হল যে, তার মনে ভয় আর লোভের একটা টানাপোড়েন চলছে। সে বুঝে উঠতে পারছিল না আমাদের সঙ্গে এলে তার লাভ হবে না ক্ষতি হবে। দোনামনা করতে করতে সে গাড়িতে চড়ে বসল। আধ ঘণ্টার মধ্যেই আমরা বেকার স্ট্রিটে পৌঁছে গেলুম। গাড়িতে আর বিশেষ কোনও কথাবার্তা হল না। তবে আমাদের সঙ্গীটি যে-রকম অস্থিরভাবে তার হাত খোলা-বন্ধ করছিল আর ফোঁস-ফোঁস করে নিশ্বাস ফেলছিল তাতে বোঝা যাচ্ছিল যে, সে মনে-মনে ভয়ানক রকম উদ্বিগ্ন।

ঘরে পা দিয়ে হোম্‌স বেশ খুশি হয়ে বললে, "আহ্‌। বাইরের হাড়-কাঁপানো ঠাণ্ডার পর ঘরের এই আগুন ভীষণ আরামদায়ক লাগছে। মিঃ রাইডার, আপনি দেখছি ঠাণ্ডায় খুবই কাবু হয়ে পড়েছেন। এই বেতের চেয়ারটায় ভাল করে বসুন। রাস্তার জুতোটা বদলে আসি, তারপর কথাবার্তা হবে।"

প্রায় সঙ্গে সঙ্গে ঘুরে এসে হোম্‌স বললে, "বেশ। আপনি জানতে চাইছেন যে, সেই হাঁসগুলো কোথায় গেল, তাই না?"

"হ্যাঁ।"

"না। আমার মনে হয় হাঁসগুলোর সম্বন্ধে নয়, আপনি জানতে চাইছেন বিশেষ একটি হাঁসের কী হল? আর সেই হাঁসটা শুধু লেজের দিকে একটা কালো ডোরা ছাড়া সবটাই সাদা। তাই তো?"

রাইডার যেন উত্তেজনায় ফেটে পড়বে বলে আমার মনে হল। "আপনি...আপনি জানেন সে হাঁসটা কোথায়?"

"সেটা এখানে এসেছিল।"

"এখানে?"

"হ্যাঁ। আর দেখা গেল সেটা একটা অসাধারণ হাঁস। সুতরাং ওই হাঁসটার সম্বন্ধে আপনার যে কৌতূহল থাকবে তাতে আমি মোটেই আশ্চর্য হইনি। আর জানেন, সেই মরা হাঁসটা একটা ডিম পেড়েছিল? একটা খুব সুন্দর চকচকে নীল

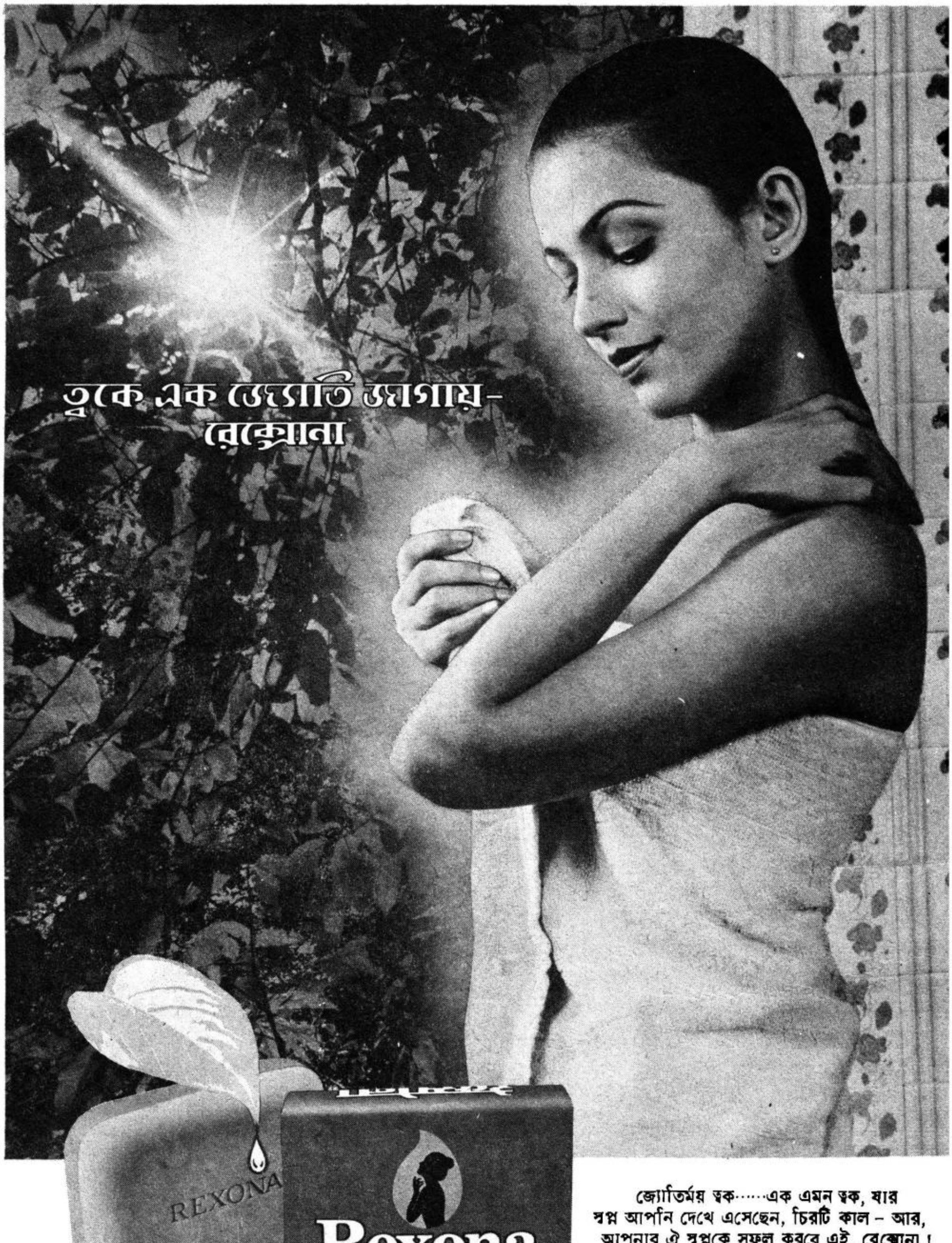

জ্যোতির্ময় ত্বক……এক এমন ত্বক, যার স্বপ্ন আপনি দেখে এসেছেন, চিরটি কাল – আর, আপনার ঐ স্বপ্নকে সফল করবে এই, রেক্সোনা !

রেক্সোনায় আছে চারটি প্রাকৃতিক তেলের মিশ্রণ—কেড, ক্যাসিয়া (দারুচিনি বিশেষ), লবঙ্গ আর টেরিবিনৃথ – যা, আপনার ত্বকের যত্ন নেয়, স্বাভাবিক উপায়ে।

রেক্সোনা আপনার ত্বক রাখে কোমল ও উজ্জ্বল!

হিন্দুস্থান লিভারের একটি উৎকৃষ্ট উৎপাদন।

LINTAS RX 84 2416 BG

রঙের ডিম। ওটা আমি আমার মিউজিয়মে রেখে দিয়েছি।" রাইডার চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল। সে টলে পড়ে যেত, দেওয়াল ধরে ফেলে কোনওরকমে সামলে গেল। হোম্‌স একটা লোহার হাতবাক্স খুললে। বাক্স থেকে নীলকান্তমণিটা বের করে তার হাতে রাখলে। সেটা খুব উজ্জ্বল তারার মতো চকচক করছিল। খুবই শুকনো মুখ করে রাইডার পাথরটার দিকে চেয়ে রইল। তার চোখের পাতা পড়ছিল না। সে ঠিক বুঝতে পারছিল না যে পাথরটা তার নিজের সম্পত্তি বলে দাবি করা ঠিক হবে কি না।

খুব ঠাণ্ডাভাবে হোম্‌স বললে, "রাইডার, তোমার খেল খতম। না, না, চুপ করে দাঁড়াও। না হলে পেছনের আগুনে পড়ে যাবে। ওয়াটসন, ওকে ধরে এনে চেয়ারে বসিয়ে দাও তো। এ ধরনের চুরি করতে গেলে যে ধরনের কড়া ধাতের লোক হওয়া দরকার এ মোটেই সে জাতের নয়। একে একটু ব্রাণ্ডি খাইয়ে দাও। ... হ্যাঁ, এবার একে মানুষের মতো দেখাচ্ছে।"

আমারও মনে হয়েছিল লোকটা হয়তো মাথা ঘুরে অজ্ঞান হয়ে পড়েই যাবে। এখন ব্রাণ্ডি খেয়ে মনে হল যেন একটু চাঙ্গা বোধ করছে। সে হোম্‌সের দিকে কাতরভাবে চেয়ে রইল।

"ব্যাপারটা কীভাবে ঘটেছে তার মোটামুটি একটা হদিস আমি পেয়েছি। তোমার কাছে নতুন করে জানবার কিছু আমার নেই। তবে যদি কোনও কিছু বাদ পড়ে থাকে সেইজন্যে সবটা তোমার কাছে ঝালিয়ে নিলে ক্ষতি নেই। ... রাইডার, তুমি নিশ্চয়ই কাউন্টেসের এই নীলকান্তমণির খবর আগে থেকে জানতে ?"

"ক্যাথরিন কুসাক আমাকে এই পাথরটার কথা বলে," গলা দিয়ে একটা ঘড়ঘড় আওয়াজ করতে করতে রাইডার বললে।

"আচ্ছা। কাউন্টেসের সেই কাজের মেয়েটি। হঠাৎ বড়লোক হয়ে যাবার লোভ তোমার চেয়ে ঢের উঁচুদরের মানুষেই সামলাতে পারে না, তুমি তো কোন্ ছার। কিন্তু বড়লোক হবার জন্যে যে রাস্তাটা ধরেছ সেটা ভাল নয়, নোংরা রাস্তা। তুমি মোটেই গোবেচারি নও। মাথাটি তোমার পেজোমিতে ভরা। তুমি নিশ্চয়ই জানতে যে, হরনার লোকটা আগে একবার চুরি করে ধরা পড়েছিল। তাই তুমি ভেবেচিন্তে ব্যাপারটা এমনভাবে সাজিয়েছিলে যে, দোষটা যাতে করে সহজে ওরই ঘাড়ে পড়ে। তাই তুমি নিজে, অথবা তুমি আর তোমার শাকরেদ কুসাক মিলে কাউন্টেসের ঘরে সামান্য ভাঙাচোরা করে রেখেছিলে আর তুমিই হরনারকে খবর পাঠাবার ব্যবস্থা করেছিলে। সে কাজ সেরে চলে গেলে তোমরা ঘরের দেরাজ ভেঙে পাথরটা চুরি করে হৈ-হট্টগোল শুরু করে দাও। আর তার ফলে হরনার শেষ পর্যন্ত ধরা পড়ে যায়। আর তখন তুমি—"

হোম্‌সকে কথা শেষ করতে না দিয়ে রাইডার সটান ঘরের কার্পেটের ওপর শুয়ে পড়ে তার পা জাপটে ধরলে। "দয়া করুন। আমার বুড়ো বাপ-মা'র কথা ভাবুন। এ-কথা শুনলে দুঃখে তাঁরা মারাই পড়বেন। ... আমি এর আগে কখনও কোনও অন্যায় করিনি। ভগবানের দিব্যি বলছি, আর আমি কখনও এরকম কাজ করব না। আমি দিব্যি করছি। আমি বাইবেল ছুঁয়ে শপথ করছি। আমাকে রক্ষা করুন, এটা যেন কোর্ট-কাছারি পর্যন্ত না গড়ায়।"

হোম্‌স কঠিনভাবে বললে, "চেয়ারে উঠে বোসো। এখন তো খুব নাকিকান্না কাঁদছ। যখন হরনারকে মিথ্যে চুরির অপরাধে জড়িয়েছিলে তখন তো ভাবনি যে, কী জঘন্য অন্যায় করতে যাচ্ছ। একজন নির্দোষ লোককে মিথ্যে-মিথ্যে বদনাম দিয়ে জেলে দেবার ব্যবস্থা করছিলে।"

"মিঃ হোম্‌স, আমি এই দেশ ছেড়ে পালাব। তাহলে হরনারের বিরুদ্ধে কোনও— ।"

"হুঁ। যাক, সে কথা পরে ভাবা যাবে। এখন তার পরের ঘটনাগুলো বলো দেখি। কী ভাবে ওই পাথরটা হাঁসের পেটে গেল আর কী করেই বা ওই হাঁসটা খোলা বাজারে বিক্রি হয়ে গেল। সত্যি বলবে। যদি আমার মনে হয় যে তুমি সত্যি কথা বলছ তাহলেই আমি বিবেচনা করে দেখব তোমাকে বাঁচানো উচিত কি না।"

রাইডার জিভ দিয়ে ঠোঁট চাটতে লাগল। "যা যা ঘটেছিল সব কথাই আমি আপনাকে খুলে বলছি। হরনারকে তো পুলিশে ধরে নিয়ে গেল। আমার তখন চিন্তা হল কোথায় পাথরটাকে রাখা যায়। আমি বুঝতে পারছিলুম না পুলিশ আমার ঘর তল্লাশি করতে আসবে কি না বা কখন আসবে। হোটেলে এমন কোনও জায়গা নেই যেখানে পাথরটা লুকিয়ে রাখা যায়। তখন আমি একটা কাজের ছুতো করে হোটেল থেকে বেরিয়ে পড়লুম। সোজা গেলুম আমার বোনের বাড়ি। আমার বোন ওকশটকে বিয়ে করে ব্রিকস্টন রোডের একটা বাড়িতে থাকে। সেখানে তারা হাঁস-মুর্গির ব্যবসা করে। আমি যখন বোনের বাড়ি যাচ্ছিলুম তখন রাস্তার সব লোককেই আমার গোয়েন্দা-পুলিশ বলে মনে হচ্ছিল আর এও মনে হচ্ছিল যে, তারা সকলেই আমার দিকে সন্দেহের চোখে তাকাচ্ছে। সেদিনের সেই প্রচণ্ড ঠাণ্ডার রাত্রেও আমার কপাল থেকে ফোঁটা ফোঁটা ঘাম ঝরছিল। আমাকে দেখে বোন তো অবাক। 'কী ব্যাপার ! তোমার শরীর খারাপ হয়েছে নাকি ? তোমার চোখমুখ বসে গেছে। তুমি ঘামছ।' আমি তাকে বললুম যে, হোটেলে একটা চুরি হয়ে গেছে। মনটা তাই ভাল নেই। তারপর তার বাড়ির পেছনের দিকে উঠোনে বসে পাইপ টানতে টানতে ভাবলুম কী করা যায়।

"মড্‌সলি বলে আমার এক বন্ধু আছে। দুষ্ট লোকের খপ্পরে পড়ে জেল-টেল খেটেছে। সম্প্রতি সে 'পেণ্টনভিল' থেকে তার মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ায় ছাড়া পেয়েছে। একবার কথায় কথায় সে আমাকে বলেছিল যে চোরাই মাল বিক্রি করার বা পাচার করার সব ঘাঁতঘোঁত তার জানা আছে। আমি জানতুম যে, সে আমাকে সাহায্য করবে। আমি তার এমন দু-একটা গোপন খবর জানি যা পুলিশের জানা নেই। তাই ঠিক করলুম কিলবার্নে গিয়ে ওর সঙ্গে দেখা করব। ও ঠিক বাতলে দেবে

আগামী সংখ্যা থেকে
শার্লক হোম্‌সের নতুন গল্প

বুটিদার ফেট্টি

ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হবে

টেনিদা, আসল টেনিদা ও দারুণ মজার মজার বই

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের কিশোর সাহিত্যের নামে শুধু ছোটদের কেন, বড়দের চিত্তও যে প্রসন্ন হয়ে ওঠে এর কারণ তাঁর রচনার রম্য ভঙ্গি, কাম্য স্বাদ। টেনিদা ও সাকরেদবাহিনীর কীর্তিকাহিনী এখন তো প্রায় কিংবদন্তী, অন্যান্য গল্প-উপন্যাসেও তিনি জলজ্যান্ত করে তোলেন ছোটদের মনের অন্ধিসন্ধিতে লুকনো দুরভিসন্ধির মিষ্টি ঘটনাগুলো। এহেন নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের যাবতীয় ছোটদের রচনা নিয়ে একদিকে যেমন প্রকাশিত হচ্ছে 'সমগ্র কিশোর-সাহিত্য' গ্রন্থমালা, তেমনি আলাদাভাবেও পাওয়া যায় তাঁর মজার মজার গল্পের বইগুলো।

'সমগ্র কিশোর সাহিত্য'র তিন খণ্ড নিয়ে কাড়াকাড়ি চলছে। আরেকটি খণ্ডও বেরুলো বলে। গল্প, উপন্যাস, নাটক, কবিতা, ছড়া, আত্মকথা, প্রবন্ধ— এমন সব-কিছু নিয়ে তৈরি হয়েছে একেকটি খণ্ড। সম্পাদনা করেছেন আশা দেবী ও অরিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়।

ওহো, এই প্রসঙ্গেই বলি আশা দেবীর 'আসল টেনিদা' নামের বইটির কথা। এর মধ্যে কী আছে জানো? যে-মানুষটিকে নিয়ে নারায়ণবাবুর টেনিদার গল্প, সেই মানুষটির আসল পরিচয় নিয়ে মজার মজার গল্প।

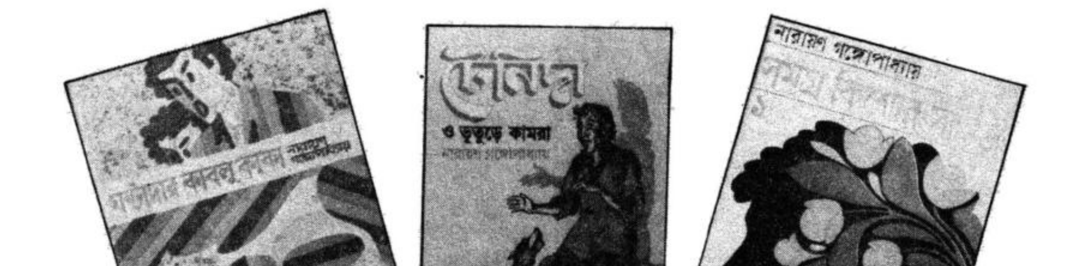

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের রচনাসম্ভার : তপন চরিত ১০·০০ ঘণ্টাদার কাবুলকাকা ৮·০০ অব্যর্থ লক্ষ্যভেদ এবং ৮·০০ টেনিদা ও ভুতুড়ে কামরা ৮·০০ সমগ্র কিশোর-সাহিত্য ১ম ২য় ও ৩য় প্রতি খণ্ড ২৫·০০ টাকা

আশা দেবীর আসল টেনিদা ১০·০০

আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা-৭০০০০৯

কী ভাবে ওই পাথরটাকে বিক্রি করা যায়। কিন্তু কথা হচ্ছে ওই পাথরটা ওর কাছে নিয়ে যাই কী করে ? যে-কোনও সময়ে পুলিশ আমার খোঁজ করতে পারে। আর তখন আমাকে তল্লাশি করলে চোরাইমাল সমেত ধরা পড়ব। আমি উঠোনের যে জায়গায় ছিলুম সেইখানে একপাল হাঁস ঘোরাঘুরি করছিল। হঠাৎ আমার মাথায় ঝাঁ করে একটা বুদ্ধি খেলে গেল। পাথরটা লুকিয়ে রাখবার এমন একটা উপায় বের করলুম যা কোনও গোয়েন্দা পুলিশের সাধ্য নেই যে খুঁজে বের করে।

"কয়েক সপ্তাহ আগে আমার বোন আমাকে বলেছিল যে, ক্রিসমাসের সময় বড়দিনের উপহার হিসেবে আমি তার যে-কোনও একটা হাঁস পছন্দ করে নিতে পারি। আমি এখনই হাঁসটা পছন্দ করে নেব, আর হাঁসটার মধ্যে পাথরটা পুরে কিলবার্ন চলে যাব। উঠোনের একদিকে একটা চালাঘর। আমি একটা বড়সড় হাঁসকে তাড়িয়ে তাড়িয়ে ওই চালাঘরের মধ্যে নিয়ে গেলুম। হাঁসটা একেবারে দুধের মতো সাদা। শুধু লেজের কাছটায় একটা কালো ডোরাকাটা দাগ। আমি হাঁসটাকে জাপটে ধরলুম। তারপর সেটার ঠোঁট দুটো জোর করে ফাঁক করে গলার মধ্যে পাথরটা ঢুকিয়ে দিলুম। হাঁসটা কোঁক করে একটা ঢোক গিললে। বুঝতে পারলুম যে পাথরটা গলা দিয়ে নেমে গেল। হাঁসটা আমার হাত থেকে পালাবার জন্যে ঝটফট করতে লাগল। এমন সময় আমার বোন বেরিয়ে এল। 'হাঁসটাকে তুমি কি করছ জেমস ?' আমি বললুম, 'কিছু নয়। তুমি তো বড়দিনের সময় আমাকে একটা হাঁস দেবে বলেছিলে তাই দেখছিলুম কোন্‌টা নেওয়া যায়।' 'ও তাই বলো। সে তো আমরা ঠিক করেই রেখেছি। আমরা সেটার নাম দিয়েছি জেমসের হাঁস। ওই তো ওইদিকে যে বড় হাঁসটা দেখছ ওইটে তোমার জন্য রাখা আছে। ওই জাতের হাঁস ছাব্বিশটা আছে। একটা তোমার জন্য, একটা আমাদের জন্যে, বাকি চব্বিশটা বিক্রির জন্যে।' 'ম্যাগি, যদি তোমার আপত্তি না থাকে তো এইমাত্র যে সাদা হাঁসটা ধরেছিলুম সেইটে নেব।' 'কিন্তু ওটার চাইতে আমরা যে হাঁসটা ঠিক করে রেখেছি সেটা অনেক বড়। ওটাকে খাইয়ে-দাইয়ে মোটাসোটা করেছি।'

'তা হোক গে। আমি ওইটেই নেব। আর আজই নেব।' 'সে তোমার ইচ্ছে।' বুঝলুম আমার বোন দুঃখ পেয়েছে। 'কোন্‌টা নেবে বলছ।' 'ওই যে লেজের কাছে কালো ডোরাকাটা সাদা হাঁসটা। ওই যে মাঝখানে রয়েছে—ওইটে নেব।' 'ঠিক আছে ওটাকে মেরে নিয়ে যাও।'

"আমি আর একটুও দেরি না করে হাঁসটাকে মেরে বোনের বাড়ি থেকেই কিলবার্ন চলে গেলুম। আমার চালাকির কথা শুনে আমার বন্ধু তো হেসেই অস্থির। তারপর আমরা দুজনে মিলে হাঁসটার পেট চিরে ফেললুম। তারপর আমার তো চোখ কপালে উঠে গেল। পেটের মধ্যে কেন হাঁসটার শরীরের কোথাও কোনও পাথর নেই। বুঝলুম সাংঘাতিক রকমের একটা ভুল হয়েছে হাঁসটাকে ওইখানে ওই অবস্থায় ফেলে রেখে আমি আবার ছুটতে-ছুটতে বোনের বাড়িতে এলুম বাড়ির পেছনে উঠোনের যে জায়গায় ওই হাঁসের খাঁচাটা ছিল সেখানে গিয়ে দেখি খাঁচা খালি। একটা হাঁসও নেই।

'ম্যাগি ওই হাঁসগুলো গেল কোথায় ?' 'দোকানদার কিনে নিয়ে গেছে।' 'কোন্ দোকানদার ?' 'কভেন্ট গার্ডেনের ব্রেকেনরিজ।' 'আচ্ছা ম্যাগি, তোমার আরও একটা লেজে কালো-ডোরাকাটা হাঁস ছিল কি ? মানে আমি যে রকম হাঁস নিয়েছি সে রকম হাঁস কি আর ছিল ?'

'হ্যাঁ, জেমস। ওই রকম হাঁস একজোড়া ছিল। ও দুটোকে আলাদা আমি নিজেও করতে পারতুম না।' ম্যাগির কথায় সব ব্যাপারটা আমার কাছে পরিষ্কার হয়ে গেল। বুঝলুম গণ্ডগোলটা কোথায় হয়েছে। আর সময় নষ্ট না করে আমি সেখান থেকে সোজা ব্রেকেনরিজের দোকানে গেলুম। তার সঙ্গে কথা বলে জানলুম যে সে সব হাঁস বিক্রি করে দিয়েছে। কিন্তু কাকে বিক্রি করেছে সে কিছুতেই বললে না। আপনারা তো শুনতেই পেলেন একটু আগে ব্রেকেনরিজ কী বললে। এদিকে আমার বোনের ধারণা হয়েছে যে আমার মাথার গোলমাল হয়েছে। আমার নিজেরই এক-একসময় মনে হচ্ছে যে, আমি বোধহয় পাগল হয়ে যাব। আমি ভাবছি আমার কী হল ! আমি চোর বনে গেলুম। অথচ মজা হচ্ছে এই যে, যে জিনিসটার জন্যে আমি চোর হয়ে গেলুম সেই জিনিসটাই আমার হাতে এল না। হা অদৃষ্ট।"

রাইডার কেঁদে ফেললে। আমরা কেউ কোনও কথা বললুম না। শুধু হোম্‌স টেবিলের ওপর আঙুল দিয়ে টকটক করে শব্দ করতে লাগল। কিছুক্ষণ পরে হোম্‌স ঘরের দরজা খুলে রাইডারকে বললে, "বেরিয়ে যাও।"

"কী... কী বললেন ? ভগবান আপনার ভাল করবেন।"

"একটি কথা নয়। বেরিয়ে যাও।"

আর কোনও কথা বলবার দরকার হল না। রাইডার এক দৌড়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। ঘরে বসেই আমরা শুনতে পেলুম, সে সিঁড়ি দিয়ে দুড়দাড় শব্দ করে নেমে গেল।

পাইপে আগুন ধরাতে ধরাতে হোম্‌স বললে, "ওয়াটসন, পুলিশ তাদের কাজের গাফিলতি দেখিয়ে দেবার দায়িত্ব আমাকে দেয়নি ; আর তা ছাড়া হরনারের শাস্তি হবার কোনও আশঙ্কাই নেই। রাইডার গা-ঢাকা দিলেই হরনারের বিরুদ্ধে কোনও অভিযোগ টিকবে না। হয়তো কাজটা ঠিক আইনসঙ্গত হল না। তবে লোকটাকে বাঁচানো গেল। ও আর কখনও এমন কাজ করবে না। এখন ওকে জেলে পাঠালে ও একটা খারাপ ধরনের অপরাধী হয়ে যেত। তাছাড়া ক্রিসমাস হল ক্ষমার সময়। বরাতজোরে আমাদের দরজায় একটা সমস্যা এসে গিয়েছিল, সেটা সমাধান করতে পেরেই আমরা খুশি। এখন চলো অন্য এক রহস্যের সমাধান করা যাক। সেখানেও অবশ্য প্রধান চরিত্র হল একটা বনমুর্গি।"

অনুবাদ : সুভদ্রকুমার সেন

(এর পরে আগামী সংখ্যায়)

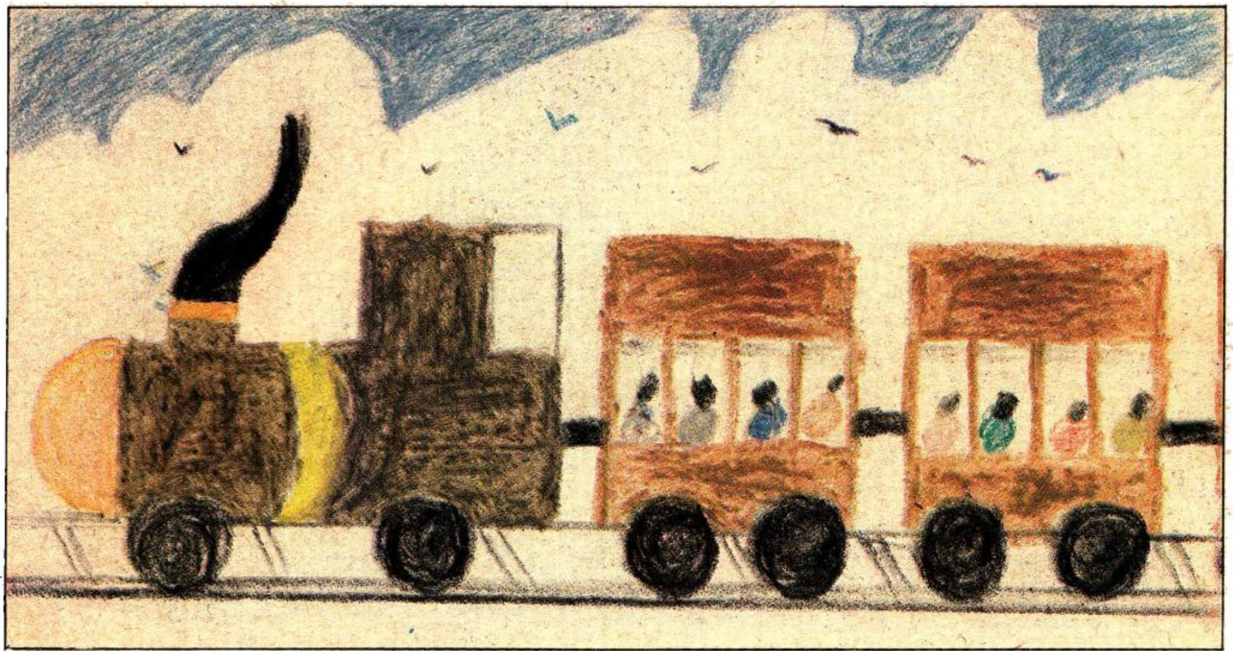

ছবি এঁকেছে **দীপাঞ্জন দত্ত** (বয়স ৬)

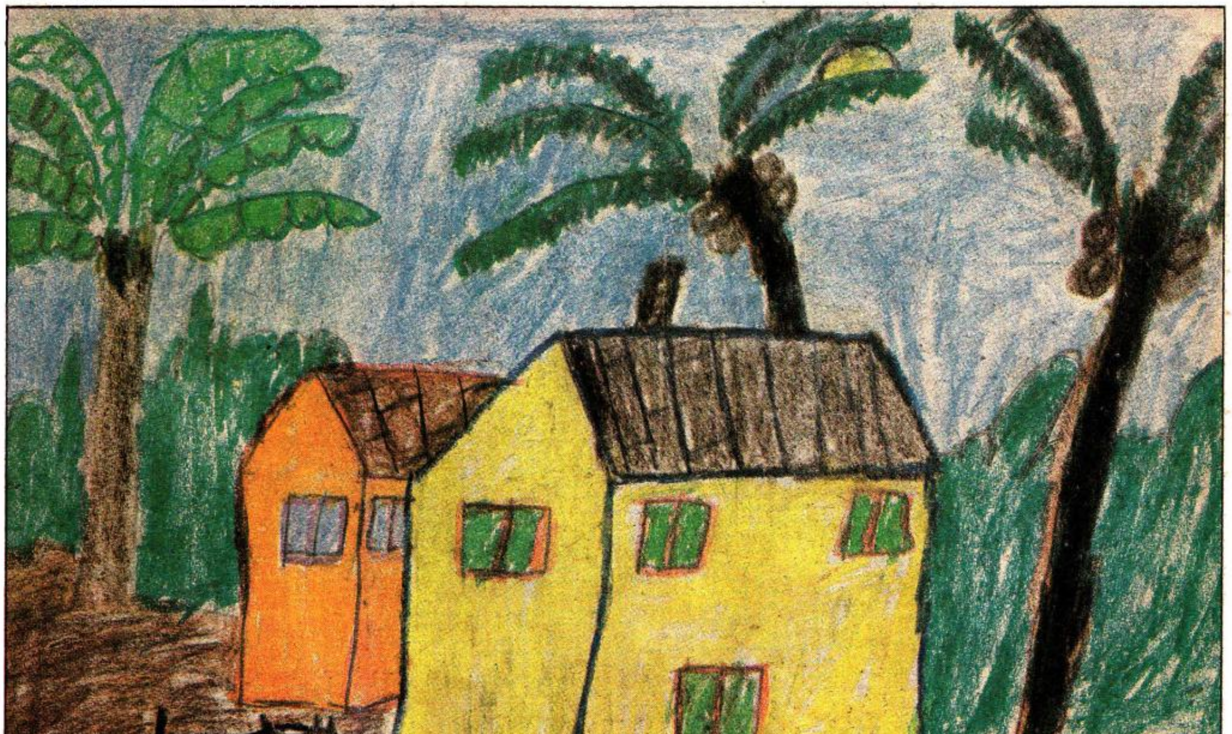

ছবি এঁকেছে **শর্মিষ্ঠা সাহা** (বয়স ৬)

ভূত, না ভূতের মতো !

শীতের ছুটিতে দেশের বাড়িতে বেড়াতে গিয়েছি। আমাদের মামারবাড়ি পাশের গ্রামে। একদিন খেয়ে উঠে ঠাকুমার সঙ্গে গল্প করতে করতে অনেক রাত্রি হয়ে গেল। শীতটাও বেশ জাঁকিয়েই পড়েছে। কিন্তু তার মধ্যেই আমি ও দাদা চাদরমুড়ি দিয়ে মাফলার-সোয়েটার পরে মামারবাড়ির উদ্দেশে বেরিয়ে পড়লাম।

একটা পুকুরের চারপাশে অনেক গাছপালাময় জায়গায় এসে পড়লাম। মামারবাড়ি আর মাত্র মিনিট-পাঁচেকের পথ। এমন সময় আমি একটা জিনিস লক্ষ করলাম। পুকুরের পাড়ে যেন একজন মানুষ পা ফাঁক করে বিরাট হাঁ করে দাঁড়িয়ে আছে।

দেখে ব্রহ্মদৈত্য ভেবে আমি খুব ভয় পেলাম। দাদাও ভয়ে কাঁপছিল। তারপর আমরা রামনাম করতে করতে ছুটতে লাগলাম। মনে হল, পিছনে কে যেন তেড়ে আসছে। একছুটে মামারবাড়ির সদর দরজায় পৌঁছলাম। আমাদের ওই অবস্থা দেখে সবাই কারণ জিজ্ঞেস করতে লাগল। সব খুলে বললাম।

মামা বললেন, “চল তো দেখে আসি জিনিসটা কী !”

আমরা কিছুতেই যেতে চাইছিলাম না। কিন্তু মামার কথায় বাধ্য হয়ে যেতে হল। মামার সঙ্গে সেই পুকুরপাড়ের জায়গাটায় উপস্থিত হলাম। সব দেখে মামা বললেন, “ওহ্, এই ব্যাপার।” বলে আমাদের টেনে নিয়ে গেলেন পুকুরপাড়ের সেই গাছতলায়। তারপর সব খুলে বললেন।

চাঁদের আলো দুটো গাছের ভেতর দিয়ে এমনভাবে এসে পড়েছে যে, মনে হচ্ছে একটা লোক দাঁড়িয়ে আছে। আর দুটো গাছকে মনে হচ্ছে পা-ফাঁক-করা লোক। তাছাড়া খেজুরের রস সংগ্রহের জন্য মাটির যে কলসি ঝোলানো হয়েছিল, সেটা দেখে মনে হচ্ছে মানুষের মাথা।

মামা বললেন, “দেখলি তো, তোরা শুধু-শুধু ভয় পেলি !” মামার কথা অস্বীকার করতে পারলাম না, তবু এখনও সন্দেহ রয়ে গেছে—আমরা সত্যিই কি ভুল দেখেছি।

অরিন্দম ঘোষ (বয়স ১৩

রাজামশাই

গত বছর পুজোর সময় বাবা, মা, দাদু ও দিদার সঙ্গে আমি বাঁশবেড়িয়ায় রাজবাড়িতে গিয়েছিলাম। স্টেশন থেকে একটু দূরেই রাজবাড়ি। পাশেই হংসেশ্বরী মন্দির অল্প এগোতেই মন্দিরের চূড়া ও রাজবাড়ির সিংহ-দরজা দেখা গেল।

প্রথমে আমরা মন্দিরে ঠাকুর প্রণাম করে মন্দিরের ভেতরটা ঘুরে দেখলাম। তারপর রাজার বাড়িতে রাজার সঙ্গে দেখা করতে গেলাম। রাজামশাই দাদুর বন্ধু, আমার তো উৎসাহের অন্ত নেই। মনে মনে কতই না জল্পনা-কল্পনা। রাজার সঙ্গে দেখা করতে যাওয়া কি কম কথা !

ওমা ! যতই ভেতরে ঢুকছি ততই দেখি, চারিদিক ফাঁকা। বিরাট প্রাসাদ কিন্তু কোথাও কেউ নেই। আমি ভাবছি রাজার প্রজা, সৈন্য-সামন্ত, নগর-রক্ষক—এরা সব কোথায় ! যাই হোক, রাজবাড়িতে তো ঢকলাম। কেউ আমাদের অভ্যর্থনা করল না। আমি তো চারিদিকে রাজসভা খুঁজছি !

দাদু আমাদের নিয়ে একটা বিরাট হ[illegible] সেখানে একজন বুড়ো ভদ্রলোক চেয়ার-টেবিলে বসে আছেন। আমি ভাবলাম দাদু বোধ হয় এঁর কাছে রাজাকে আমাদের আগমনবার্তা দিতে বলছেন।

ওমা ! একটু পরে দাদু আমাদের সঙ্গে ভদ্রলোকের পরিচয় করিয়ে দিয়ে বললেন, “এই দেখ রাজামশাই।”

আমার তো চোখে জল এসে গেল। ইনি রাজামশাই ! রাজসভা কই ? সিংহাসন, রাজমুকুট—কোথায় ? এ তো প্যান্ট-শার্ট-পরা দাদুর মতোই ভদ্রলোক।

সুবর্ণা বন্দ্যোপাধ্যায় (বয়স ৯)

গোলমাল

শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়

আগে যা ঘটেছে : হরিবাবুকে একটা উটকো লোক জানায়, সে তাঁর স্বর্গত পিতা শিবু হালদারের কাছ থেকে আসছে। একটা চাবি দিয়ে সে বলে, "ঈশান কোণ, তিন ক্রোশ।" লোকটা নাকি বিজ্ঞানী শিবুবাবুর শাকরেদ ছিল, শিবুবাবুকে সে সূক্ষ্ম পিস্তল দিয়ে তিন-তিনটে কালাসাহেবকে খুন করতে দেখেছে। তাঁর তৈরি আকাশী জামা পরে শূন্যে ঘোরা যেত। শেষ পর্যন্ত তিনি ওলন্দাজের হাতে মারা যান। হরিবাবুর ছোটভাই ন্যাড়া গজ-পালোয়ানের কাছে কুস্তি শেখে, আর-এক ভাই জরিবাবু কালোয়াতি গান করেন। দুজনকেই সে ভূতের ভয় দেখিয়েছে। কিন্তু জরিবাবু যখন বলেন যে, সত্যি তিনি ভূতের ধাক্কা খেয়েছেন, উটকো লোকটা তখন নিজেই যেন ঘাবড়ে যায়। হরিবাবুর দুই ছেলের নাম ঘড়ি ও আংটি। দুর্দান্ত খেলে তারা জেলা স্কুলের বিরুদ্ধে ক্রিকেট ম্যাচে বিনোদ হাই-কে জিতিয়ে দিয়েছে। তারপর···

খেলার শেষে দুই ভাইকে কাঁধে নিয়ে বিনোদ হাই-এর ছেলেরা মাঠে চক্কর দিল। কত লোক যে এসে পিঠ চাপড়াল, ভীম আলিঙ্গনে জড়িয়ে ধরল আর হ্যাণ্ডশেক করল, তার হিসেব নেই। অভ্যেস না থাকলে এরকম আদরের আতিশয্যে শরীরে ব্যথা হওয়ার কথা। তবে কিনা ঘড়ি আর আংটি খেলার মাঠে এরকম পাইকারি ভালবাসা অনেক পেয়েছে।

বিনোদ হাই-এর গেম-স্যার পাঠান সিং। নামটা পাঠানি হলেও আসলে তিনি নির্যস বাঙালি। ছেলেবেলা থেকেই বীরত্বের প্রতি তাঁর তীব্র আকর্ষণ। পাঠানরা যে বীরের জাত, তাও তাঁর জানা ছিল। তাই ম্যাট্রিকের ফর্ম পূরণ করার সময় তিনি নিজের পল্লব নামটা পাল্টে অম্লানবদনে পাঠান করে দিলেন। এর জন্য হেডস্যারের বেত এবং বাপের চটির ঘা সহ্য করতে হয়েছিল বিস্তর। কিন্তু একবার ম্যাট্রিকের ফর্মে যে নাম উঠে যায়, তা নাকি আর পাল্টানো যায় না। পাঠানবাবু খেলা-পাগল মানুষ। নিজেও সব রকম খেলাধুলো করেছেন যৌবন-বয়সে। কোনও খেলাতেই বিশেষ নামডাক হয়নি। তবে গেম-স্যার হিসেবে তিনি চমৎকার। ছেলেদের প্রাণ দিয়ে খেলা শেখান। ঘড়ি আর আংটি তাঁর বিশেষ ভক্ত।

হৈ-চৈ একটু থামলে এবং পুরস্কার বিতরণ শেষ হলে পর পাঠানবাবু এসে ঘড়ি আর আংটিকে চুপি-চুপি আড়ালে ডেকে নিয়ে বললেন, "তোমাদের ভাগ্য খুবই ভাল। আজ হাতরাশগড়ের মহারাজা নরনারায়ণ রায় মাঠের পাশে তাঁর গাড়িতে বসে তোমাদের খেলা দেখেছেন। ভদ্রলোকের নাম শোনা ছিল, আগে কখনও চোখে দেখিনি। তবে বিশাল ধনী। ওঁর খুব ইচ্ছে তোমাদের ভাল করে খেলা শেখার সুযোগ করে দেবেন। খরচ সব ওঁর। খেলা শেষ হওয়ার পর ওঁর সেক্রেটারি এসে আমাকে ডেকে নিয়ে গিয়েছিল মহারাজার কাছে।"

দুই ভাই একটু অবাক হয়ে মুখ-তাকাতাকি করতে লাগল।

পাঠানবাবু হেসে বললেন, "কপাল যখন ফেরে, এমনি করেই ফেরে। এখন চলো, মহারাজ তোমাদের জন্য বসে আছেন।"

পাঠানবাবুর পিছু-পিছু দুই ভাই গিয়ে দেখে, জামতলায় বিশাল একখানা পুরনো মডেলের গাড়ি দাঁড়ানো। জানালার পর্দা রয়েছে বলে ভিতরে কিছু দেখা যায় না। তবে দরজার কাছেই মহারাজের লম্বা সুড়ঙ্গে চেহারার সেক্রেটারি অপেক্ষা করছিল। কাছে যেতেই খুব সম্ভ্রমের সঙ্গে দরজা খুলে গলা খাঁকারি দিল।

ভিতর থেকে বিশাল চেহারার এক ভদ্রলোক বেরিয়ে এলেন। যেমন লম্বা, তেমনি চওড়া। ভুঁড়ি নেই, চর্বি নেই, বেশ শক্তপোক্ত শরীর। বয়সও বড়জোর ত্রিশ-পঁয়ত্রিশ। পরনে কালো স্যুট। মহারাজার গায়ের রং খুব ফর্সা নয়, তবে চেহারায় বেশ একটা অহংকারী আভিজাত্যের ছাপ আছে। চোখে হালকা রঙের গগলস এবং মোটা গোঁফ থাকায় বেশ সুন্দর দেখাচ্ছিল মহারাজাকে।

মহারাজা হাত বাড়িয়ে দুই ভাইয়ের সঙ্গে যখন হ্যাণ্ডশেক করলেন, তখনই ঘড়ি আর আংটি বুঝে গেল যে, মহারাজার একটি হাতেই দশটা হাতির জোর। হ্যাণ্ডশেকের পর দুই ভাই-ই গোপনে বাঁ হাত দিয়ে ডান হাতটা একটু মালিশ করে নিল।

মহারাজা যখন হাসলেন, তখন দেখা গেল তাঁর দাঁতের পাটিও খুব সুন্দর এবং ঝকঝকে। বজ্রগম্ভীর কণ্ঠস্বর। সেই স্বরেই বললেন, "একটা জরুরি কাজে এখান দিয়ে যাচ্ছিলাম। ক্রিকেট খেলা হচ্ছে দেখে গাড়িটা দাঁড় করিয়েছিলাম কিছুক্ষণের জন্য। কিন্তু তোমরা এমন খেলাই দেখালে যে, শেষ অবধি কাজে আর যাওয়াই হল না। যাকগে, আমি ঠিক করে ফেলেছি, তোমাদের দুজনকে কলকাতায় পাঠাব। ভাল কোচের কাছে খেলা শিখবে। ফার্স্ট ডিভিশনে খেলার ব্যবস্থাও হয়ে যাবে। পড়াশুনো এবং হস্টেলে থাকার খরচ আমার এস্টেট থেকে দেওয়া হবে। রাজি ?"

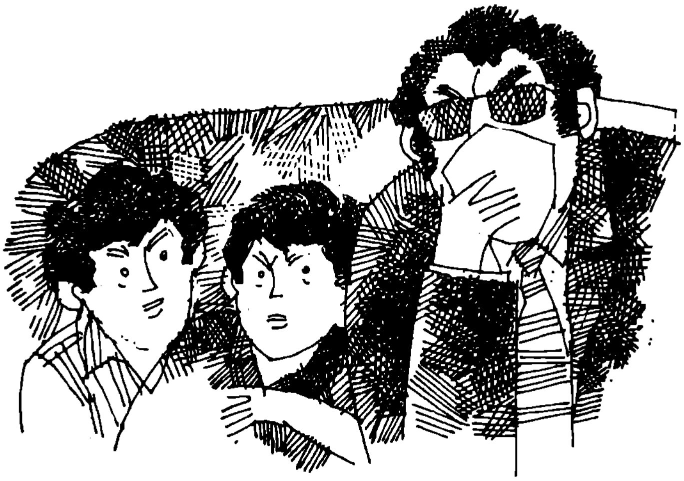

আলাদিনের প্রদীপ থেকে জিন বেরিয়ে এলে যেমন হত, দুই ভাইয়ের এ-কথায় সেইরকমই হল। কিছুক্ষণ কথা-টথা এলই না মুখে।

পাঠান-স্যার তাড়াতাড়ি বললেন, "হ্যাঁ, হ্যাঁ, খুব রাজি। এত বড় সুযোগ কি আর পাবে।..."

ঘড়ি একটু ঘাড় চুলকে বলল, "বাবাকে একবার জিজ্ঞেস না করে তো কিছু বলা যাবে না..."

মহারাজা হাসলেন, বললেন, "আরে সে তো আমি জানি। তবে আমি যখন ডিসিশন নিই, তখন সেটা কাজে করে তুলতে দেরি আমার সয় না। তোমাদের বাবার কাছে এখনই গিয়ে মত করিয়ে নিচ্ছি। ওঠো, গাড়িতে ওঠো।"

এই বলে মহারাজা গাড়ির ভিতরে ঢুকে গেলেন। সেক্রেটারি দরজাটা ধরে রেখে ঘড়ি আর আংটিকে ইশারা করল উঠে পড়তে। দুই ভাই একটু ইতস্তত করে উঠে পড়ল। তাদের পিছু-পিছু পাঠান-স্যারও উঠতে যাচ্ছিলেন। কিন্তু সেক্রেটারি পট করে দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে একটু কঠিন দৃষ্টিতে চেয়ে বলল, "সরি স্যার, গাড়িতে আর জায়গা নেই।"

পাঠানবাবু কাচুমাচু হয়ে ফিরে গেলেন।

গাড়ির ভিতরে দুই ভাই বাইরের এই ঘটনা কিছু টের পেল না। তবে গাড়ির ভিতরকার ব্যবস্থা দেখে তারা মুগ্ধ। নরম গদি। সামনে পা ছড়ানোর অনেকটা জায়গা। মেঝেয় পুরু কার্পেট পাতা। তা ছাড়া বাইরের কোনও শব্দ আসে না ভিতরে। সামনের সিট আর পিছনের সিটের মাঝখানে একটা কাচের পার্টিশন দেওয়া। কেউ কারও কথা শুনতে পায় না।

দুই ভাইয়ের মধ্যে ঘড়ি একটু বেশি বুদ্ধিমান, এবং তার পর্যবেক্ষণও বেশ তীক্ষ্ণ। গাড়ি ছাড়ার পরেই তার খেয়াল হল যে, পাঠান-স্যার গাড়িতে ওঠেননি। পিছনে তারা তিনজন, এবং সামনে সেই সেক্রেটারি বসে গাড়ি চালাচ্ছে। ঘড়ি আরও লক্ষ করল যে, মহারাজা, তাদের বাড়ির ঠিকানা জিজ্ঞেস করলেন না। গাড়ি কিন্তু বেশ স্পিডে চলছে।

মহারাজা একদৃষ্টে সামনের দিকে চেয়ে ছিলেন। সেইভাবে বসে থেকেই বললেন, "তোমাদের নিশ্চয়ই জানা আছে যে, আজকাল খেলাধুলোর কদর খুব বেশি। ভাল খেলোয়াড়দের ভবিষ্যৎ খুবই উজ্জ্বল। সঙ্গে একটু লেখাপড়া জানা থাকলে তো কথাই নেই।"

ঘড়ি হঠাৎ জিজ্ঞেস করল, "আপনি নিজেও নিশ্চয়ই খেলাধুলো কিছু করেন?"

মহারাজা একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, "ইচ্ছে তো খুবই ছিল, কিন্তু এস্টেট আর ব্যবসা নিয়ে এত ব্যস্ত থাকতে হয় যে, সময় দিতে পারি না। একসময়ে আমি অ্যামেরিকায় মার্শাল আর্ট শিখতাম। বেসবলও খেলেছি। তবে এখন আর কিছু করি না।"

ঘড়ি খুব সন্তর্পণে আংটিকে একটা চিমটি ছিল।

দুই ভাইয়ের মধ্যে বোঝাপড়া চমৎকার। চিমটি খেয়ে আংটি চমকাল না বা কোনও প্রশ্ন করল না। কিন্তু হঠাৎ একটু সোজা হয়ে বসল। দাদা তাকে সাবধান হতে বলছে।

গাড়িটা শহর ছাড়িয়ে এসেছে। কিন্তু ঠিক কোন পথে যাচ্ছে তা বোঝা মুশকিল। গাঢ় খয়েরি রঙের পর্দায় জানালাগুলো একদম ঢাকা। সামনের কাচ দিয়েও কিছু দেখার উপায় নেই। কারণ, পিছনের সিটের গদি নিচু এবং গভীর। সামনের সিটটা অনেকটা উঁচু বলে উইণ্ডস্ক্রিনটাকে আড়াল করে আছে।

ঘড়ি হঠাৎ বলল, "মহারাজ, আমরা কোনদিকে যাচ্ছি?"

"কেন, তোমাদের বাড়িতে।"

"আপনি কি আমাদের বাড়ি চেনেন?"

মহারাজা একটু হাসলেন। তারপর পকেট থেকে একটা রুমাল বের করে নাকটা চাপা দিয়ে বললেন, "আমার সেক্রেটারি চেনে।"

ঘড়ি আংটির পায়ে ছোট্ট একটা লাথি মারল।

কিন্তু দুই ভাই এখনও বুঝতে পারছে না ব্যাপারটা কী ঘটছে। একটু প্রস্তুত ও সতর্ক হয়ে বসে থাকা ছাড়া তাদের আর কিছুই করার নেই।

মহারাজা হঠাৎ একটু কাসলেন। তারপর পিছনে হেলান দিয়ে বসে চোখ বুজলেন। নাকটা তেমনই রুমালে চাপা দেওয়া।

হঠাৎ ঘড়ি আর আংটি মৃদু অস্বস্তিকর একটা গন্ধ পেল। ঘড়ি আর আংটির বহুবার হাত-পা ভেঙেছে। কয়েকবার হাসপাতালে হাড় জোড়া দিতে তাদের অজ্ঞান করা হয়েছে। অজ্ঞান করার জন্য ব্যবহৃত গ্যাসের গন্ধ তাদের চেনা। এ-গন্ধটা অনেকটা সেরকম।

ঘড়ি আংটির দিকে চেয়ে চাপা, প্রায় নিঃশব্দ গলায় বলল, "অ্যাকশন!"

মারপিট দাঙ্গাবাজিতে দুজনেই সিদ্ধহস্ত। তার ওপর মহারাজা চোখ বুজে আছেন।

আংটি হাতের পাঞ্জাটা শক্ত করে আচমকা তরোয়ালের মতো সেটা চালিয়ে দিল মহারাজার গলায়। একই সঙ্গে ঘড়ি আর-একটা ক্যারাটে চপ বসাল মহারাজার মাথার পিছন দিকটায়।

নিঃশব্দে মহারাজা দরজার দিকে ঢলে পড়লেন। মাথাটা কাত হয়ে লটপট করতে লাগল।

মহারাজার সেক্রেটারি কিছু টের পাওয়ার আগেই ঘড়ি তার দিককার দরজাটার হাতল ঘুরিয়ে প্রস্তুত হয়ে রইল। গাড়ির স্পিড একটু কমলেই দরজা খুলে লাফিয়ে পড়বে।

(ক্রমশ)

ছবি : দেবাশিস দেব

ভদ্রলোকের হাতে উঠে এল ছোটমামার গোঁফ

যাত্রার একরাত

সমীর মুখোপাধ্যায়

ওলাইচণ্ডীতলায় প্রত্যেকবারের মতো এবারেও যাত্রার জমজমাট আসর। মোশান-মাস্টার শচীনদা বলেছে, "এবার চিৎপুর থেকে বড় দল আসছে, গণেশ অপেরা। হৈ-হৈ ফেলে দেবে একেবারে। লাগাও।"

এই 'লাগাও' কথাটার মানে বুঝতাম না। কেন যে শচীনমাস্টার সব কথার শেষে 'লাগাও' কথাটা জুড়ে দিতেন তা বুঝতাম না। মামাবাড়িতে থাকি। কুচোকাচাদের মধ্যে আমি, দাদা আর ছোটমামা। আমার বয়েস ছয়, দাদার দশ, ছোটমামার বয়েস বারো। ছোটমামা বয়েসেও বড় আর খুব স্যাণ্ডো। ছোটমামা আমাদের, বিশেষ করে দাদাকে, খুব ঠ্যাঙাত। ছোটমামার এই ঠ্যাঙানি দিদ্‌মার নজরে পড়ে গেলে ছোটমামার কপালে দুঃখু ছিল অনিবার্য। সেইজন্যে ছোটমামা একটা নতুন ধরনের পদ্ধতি বার করেছিল মারের। আমরা পর পর তিনজন পাশবালিশের মতো ঘুমোচ্ছি। ঘুমোতে-ঘুমোতে ছোটমামা হঠাৎ চোখ বুজে বিছানায় উঠে বসত। তারপর যাকে হাতের কাছে পেত তাকে দমাদ্দম কিলিয়ে আবার ঘুমিয়ে পড়ত। ধরা পড়লে ছোটমামা বলত, "ঘুমের ঘোরে এটা হয়ে গেছে। স্বপ্ন দেখছিলাম পিসিমা।"

দিদ্‌মা কিন্তু বেশিদিন ছোটমামার এ যুক্তি মানল না। আমাদের বলে দিলে, "কড়ে ফের যদি তোদের কিলোয় ঘুমের ঘোরে, তোরাও ঘুমের ঘোরে দুজনে মিলে ওকে কিলোবি। যদি ষণ্ডাটা ফের মারতে আসে তো আমাকে জাগিয়ে দিবি।"

তা, সে যাক। মেলার দিন যত ঘনিয়ে আসছে আমরাও তত ভাল হয়ে থাকবার চেষ্টা করছি। সকালে দাদার কোনোদিনই দাঁত মাজার অভ্যেস ছিল না। মেরেধরে মা যখন দাদার এই আলসেমিটা ছাড়াতে পারত না, তখন দিদ্‌মার শরণাপন্ন হত। দিদ্‌মাকে বাড়ির সবাই—এমনকী বড়মামা, মেজমামা, যাদের অনেক বয়েস হয়ে গেছে, বিয়েটিয়ে হয়ে গেছে—ওরাও, ভয়ে তটস্থ থাকত। দিদ্‌মা এমনই ছিল জবরদস্ত। দিদ্‌মা সামনে দাঁড়ালে দাদা তো কোন ছার—কারুরই জারিজুরি খাটত না। কিন্তু যাত্রার দিন যত ঘনিয়ে আসছে দিদ্‌মা কেন, মাকেও কোনো কিছু বলতে হচ্ছে না, দাদা ঠিকঠিক দাঁত মেজে যাচ্ছে আর দাঁত যে মেজেছে দিদ্‌মাকে বোঝাবার জন্যে খালি দিদ্‌মার সামনে ফ্যাক-ফ্যাক করে হেসে দাঁত দেখাচ্ছে।

ছোটমামার পেয়ারাগাছে বসে এগজামিনের পড়া করার অভ্যেস। যাত্রা যত ঘনিয়ে আসছে ছোটমামা তত পেয়ারাগাছ থেকে দূরে থাকছে। আর আমি, আমাকে বলতেও হচ্ছে না, দিদ্‌মা দুপুরে ঘুমোতে গেলে আমি দিদ্‌মার পাশটিতে শুয়ে পাকাচুল একশোটা করে তুলে দিয়েও দশটা পয়সার জন্যে হাত বাড়াচ্ছি না।

কিন্তু এতসব করলে কী হবে, যাত্রার দিন যত ঘনিয়ে

আসছে, ততই বুকের ঢিবঢিবিনি বেড়েই যাচ্ছে। যতরকম উপায় আছে সবরকমেই দিদ্‌মার মন ভেজানোর চেষ্টা করেছি, কিন্তু দিদ্‌মা যে সন্তুষ্ট তা তার মুখ দেখে বোঝার উপায় নেই। বলে দিলেই হল—"ছোটরা কেউ এবার যাত্রা দেখতে যেতে পারবে না।" আর কে না জানে, একবার বলে দিলে তা আর ওলটাবার উপায় দিদ্‌মারও জানা নেই! মেলাতলায় প্রথম নাইটেই হবে 'জরাসন্ধ পালা'। বড়মামা সাজবে ভীম। মেজোমামা জরাসন্ধ। সে এক এলাহি ব্যাপার। পাড়ায়-পাড়ায় কুচোকাচাদের মধ্যে দু-ভায়ের এই লড়াই নিয়ে দু-দুটো পার্টি হয়ে গেছে। বালির মোড়ের ছেলেরা 'জরাসন্ধ পার্টি', আর চকবাজারের ছেলেরা 'ভীম পার্টি'। রোজ বাড়িতে দু-মামার রিহার্শালে কাক-চিল বসতে পারে না।

দেখতে-দেখতে যেদিন জরাসন্ধ পালা আরম্ভ হবে সেদিনটা এসে গেল। সেদিন সকাল থেকেই আমাদের বাড়িতে তুমুল উত্তেজনা ভেতরে-ভেতরে। বড়মামা, মেজোমামা পুরো যাত্রার মেজাজে আছে। পাড়ায়-পাড়ায়, রকে, ধাপিতে ওই এক আলোচনা, আজ দাদা-ভায়ে লড়াই, দেখা যাক, কে জেতে কে হারে। সারাদিন দিদ্‌মার একটি কথাও নেই। সন্ধের সময় আমাদের ডেকে রাত্রির খাবারের পাট চুকিয়ে দিল। তারপর একসময় বনের ধারে যে ঘরটায় বসে আমরা দুই ভাই আর ছোটমামা পড়াশুনো করতাম, সেই ঘরে আমাদের ঢুকিয়ে দিয়ে বাইরে থেকে দরজায় তালা ঝুলিয়ে দিয়ে দিদ্‌মা বলল, "যাত্রা হবে একমাস ধরে। তোমরা শেষের তিন দিন দেখতে পাবে। আমি একদিনই ঠিক করেছিলাম, পরে মত বদলাই। যা সব এগজামিনের রেজাল্ট!" দিদ্‌মা চলে গেল।

"বাবাঃ! যা কড়া মেজাজ, একবারে লাটসাহেব। তুমি ঠিক করলে তিনদিন। তা তুমি ঠিক করে দেবার কে বাপু!"—দাদা গজগজ করতে লাগল।

"দেখেছিস দাদা।" আমি বললাম, "নিজেদের বেলায় আঁটিশুঁটি। কেন? তোমরা রোজ-রোজ যাত্রা দেখবে কেন? ইশ্! আজ বড়মামা, মেজোমামা ফাটাফাটি করবে। পাড়ার সব ছেলে যাচ্ছে। আমাদের মামা পার্ট করবে আর আমরাই দেখতে পাব না।" আমি কেঁদে ফেললাম।

ছোটমামা এতক্ষণ কোনো কথা বলেনি। আমাদের আক্ষেপ শুনছিল আর মৃদু মৃদু হাসছিল। হঠাৎ উঠে দাঁড়াল বিজ্ঞের মতো, তারপর চালিয়াত ভঙ্গিতে বলল, "উপায় নেই তা নয়, কিন্তু কঠিন। এই শোন। আমি পিসিমাকে তো চিনি। সেইজন্যে একমাস আগে থেকেই জানলার একটা কাঠের গরাদ আলগা করে রেখেছি। গরাদটা যদি সরানো যায় তাহলে অনায়াসে জানলা দিয়ে মাথা গলিয়ে নীচে লাফিয়ে পড়া যায়। নীচে তো বন আর বড়-বড় উলুঘাস। গায়ে লাগবে না।"

আমরা বললাম, "সত্যি!"

"সত্যি কি না দ্যাখ, মামা মিথ্যে বলে না।"

ঠিক, ওপর থেকে দেখলে মনে হবে গরাদটা ঠিকই আছে, কাছে গিয়ে হাত দিয়ে আমি যে আমি, আমিও খুলে ফেলতে পারি, ছোটমামা গরাদটাকে এমন ফোঁপরা করে রেখেছে। তারপর আর কথা নয়, আমরা গরাদ দিয়ে মাথা গলিয়ে, নীচে বনের মধ্যে ঝুপঝাপ করে লাফিয়ে পড়লাম, এমন কিছু সেটা একটা ব্যাপার নয়।

নীচে নেমে ছোটমামা বললে, "আমরা খানিকটা দেখব। এই তিন-চার ঘণ্টা। পালা ভাঙবার আগেই ওখান থেকে কেটে পড়ে এই জানলার গরাদ দিয়ে ভেতরে ঢুকে শুয়ে পড়ব। পিসিমার সাধ্যি নেই ধরতে পারে!"

'জরাসন্ধ পালা' দেখতে পাওয়ার আনন্দে উত্তেজনায় সেই নির্জন গাঢ় অন্ধকার একগলা বনের মধ্যে আমরা টগবগ করে ফুটতে লাগলাম। বললাম, "ছোটমামা, ছুট লাগাই?"

"এত সোজা নয়! তাহলেই তুমি পিসিমাকে চিনেছ। দাঁড়া চুপ মেরে। আমি তোদের সাজিয়ে দিই।"

তারপর শুরু হল এক আজব কাণ্ড। ছোটমামা ওর নিজস্ব প্যাকেটটা খুলে ফেলল। সেখান থেকে একে একে বার করল পরচুল, খনিকটা সাদা পাটের ফেঁসো, তিনটে ছেঁড়া-ছেঁড়া গামছা আর গাম—যাকে বলে আঠা। আমরা কিছু বোঝার আগেই মামা বলল, "আমরা তিনজনেই দরোয়ান সাজব। আমি হব হেড দরোয়ান।" বলে মামা আমাদের সাজিয়ে দিল। নিজেও সাজল। তারপর একটু নিচু হয়ে ঝোপের ভেতরে হাত ঢুকিয়ে বার করে আনল তিনটে ছোটখাটো খেঁটে—যারা রাখালি করে তাদের কাছে যা পাওয়া যায়। সাজটাজ হয়ে গেলে মামা হুকুম দিল, "তাড়াহুড়োর কিছু নেই। বেশ ভারিক্কি চালে যাত্রাতলায় ঢুকবি। কেউ কিছু বুঝতে পারবে না।"

আমরা তাই করলাম। যাত্রার আসরে গিয়ে দেখি জায়গাটা একবারে তপ্ত খোলার খইয়ের মতো ফুটছে। বাদামভাজা আর তেলেভাজার মচমচ আর ছ্যাঁক-ছোঁক শব্দে, অগুনতি মানুষের ভিড়, অন্ধকারে এখানে-ওখানে পেট্রোমাক্সের ধকো-ধকো আলোয় রীতিমত জমে গেছে। ভিড়ের ভেতর মাথা গলিয়ে আমরা তন্ময় হয়ে শুনছি। বড়মামা ভীমের বেশে হা-হা করে হেসে বলছে, "ধর রে, ধর রে মোর প্রথম আক্রমণ।"

মেজোমামা সেজেছে জরাসন্ধ। মেজোমামাও কিছু কমতি যায় না। গদা দিয়ে বড়মামার গদা আটকে দিয়ে হা-হা করে জোরে হেসে বলল, "ব্যর্থ, ব্যর্থ আক্রমণ তব।" এতে বড়মামার অপমান হল, বড়মামা দাঁত কড়মড় করে বললে, "ধর রে, ধর রে মোর দ্বিতীয় আক্রমণ।" মেজোমামাও গরম হয়ে বলল এবারেও, "হা—হা—হা, ব্যর্থ ব্যর্থ আক্রমণ তব।" বড়মামা আরও গরম হয়ে উঠেছে, "ধর রে, ধর রে মোর তৃতীয় আক্রমণ।"

আমার ততক্ষণে চিকের দিকে যেখানে মেজোমামি আর বড়মামি বসে আছে, সেদিকে চোখ চলে গেল। বাপ রে, দুই মামির সে কী হাসি। এ ওর গায়ে ঢলে পড়ছে। বড়মামার চতুর্থ আক্রমণ মেজোমামা ঠেকাতে না ঠেকাতেই হঠাৎ সেই কাণ্ডটা ঘটল। হঠাৎ একজন লোক, বেশ বড়মতো, ছোটমামার মুখের দিকে তাকাল, বললে, "তুই, তুই কে রে!'

ছোটমামা লম্বা পাকা গোঁফে একটু তা দিয়ে ভারিক্কি চালে বলল, "আমি হেড দরোয়ান।"

"দরোয়ান!" বলেই ভদ্রলোক একটান মারল ছোটমামার গোঁফ ধরে। ভদ্রলোকের হাতে উঠে এল ছোটমামার গোঁফ, আর তাকিয়ে দেখি ছোটমামা ছুট লাগিয়েছে। বিপদ আঁচ করে দাদার হাতে একটা হ্যাঁচকা টান মেরে আমিও ছুট। ততক্ষণে একটা শোরগোল পড়ে গেছে, তুমুল হাসি টিটকিরি, আর "ওরে ধর, ছোঁড়াগুলোকে ধর।"

কোথায় পাবে আমাদের ? হুঁ, ধরবে ! খানিকটা পথ গিয়ে আমরা মসজিদতলায় গিয়ে জড় হলাম। ছোটমামা বলল, "ওই, হল্লা হচ্ছে। এখানে থাকাও ঠিক নয়। চল, গঙ্গার ধারে চলে যাই।" বনে বনে গঙ্গার ধারে চলে গেলাম। ছোটমামা ফোঁস করে একটা নিশ্বাস ফেলল। বলল, "দূর, ভাল লাগে না। আমার নিরুদ্দেশ হয়ে যেতে ইচ্ছে করে।" আমি বললাম, "সেই ভাল। একদিন নিরুদ্দেশ হয়েই যাব। এ আর ভাল লাগে না। আজ চলো বাড়ি যাই। আমার ভীষণ ভয় করছে।"

তার পরের দিন রাত আটটার সময় দিদ্‌মা ঠিক কালকের মতোই আমাদের ঘরের ভেতর দিয়ে বাইরে থেকে তালা ঝুলিয়ে বলল, "যদি এসে শুনি ষাঁড়েরা—তোমরা গুঁতোগুঁতি করে মরেছ—তবে তোদের একদিন কি আমার একদিন।" বাড়িসুদ্ধ ঝেঁটিয়ে সব্বাইকে নিয়ে, আঁচলে চাবির গোছা বেঁধে, মুখে পান-দোক্তা ফেলে দিদ্‌মারা সব মেলাতলায় চলে গেলে বনের ধারের সেই বন্ধ ঘরটায় হ্যারিকেনের লালচে, ঘোর-ঘোর আলোয় আমরা যখন এগ্‌জামিনের পড়ার নাম করে বিকেলবেলায় পাড়া আধ-খাওয়া ডাঁশা পেয়ারায় কামড় বসাচ্ছি—ঠিক এমন সময় বেজে উঠল দূর থেকে যাত্রাদলের কনসার্ট। নিশুতি রাতে বেজে উঠল সেই সুর। সেই পাগল-করা চনমনে সুর যেন আমাদের নাম ধরে ডাকতে লাগল—ওরে আয়, চলে আয়। ওরে সব ঘরদুয়োরের তালা ভেঙে, দিদ্‌মা-পিসিমার চোখ-রাঙানি অগ্রাহ্য করে, এগ্‌জামিনের পড়ার বইয়ের পাতা হাওয়ায় উড়িয়ে দিয়ে চলে আয় এই মেলাতলায়। হ্যাজাকের আলোর নীচে এক্ষুনি শুরু হবে তলোয়ারে তলোয়ারে ঝটাপটি। ওই, বেজে উঠেছে যুদ্ধের দামামা, ওই···ওরে, চলে আয়।

ছোটমামা এতক্ষণ বেশ শক্ত ছিল, হঠাৎ কেঁদে ফেলল, বলল, "দাঁড়া। একবার বড় হই। বড় হলে সবচেয়ে আগে পিসিমাকে ঘরে পুরে তালাবন্ধ করে আমরা সব যাত্রা দেখতে যাব। তখন বুঝবে মজাটা।"

দাদা সঙ্গে সঙ্গে বলল, "তোমার যেমন বুদ্ধি মামা ! তখন দিদ্‌মাকে পাচ্ছ কোথায় ? দিদ্‌মা তখন স্বর্গে !"

আমি বললাম, "আর বোধহয় বড় হতে পারব না কোনোদিন। ছোটই থেকে যাব আজীবন। আচ্ছা মামা, কাল গোঁফ ছিল বলে ধরা পড়ে গেলাম। আজ যদি গোঁফ না লাগাই—"

ছোটমামা বলল, "দূর পাগ্‌লা ! গোঁফ দিয়ে কিছু হয় না। আসলে আমরা ছোট কি না ! কী আর করা যাবে। এরা সব মজা করে যাত্রা দেখুক, আর আয় আমরা এখন এগ্‌জামিনের পড়া করি, হুঁ, যত সব !" বলে আমার হাত থেকে ছোঁ মেরে পেয়ারাটা ছিনিয়ে নিয়ে ছোটমামা ভীষণ আক্রোশে কচকচ করে কামড়ে পেয়ারাটা খেতে লাগল। ততক্ষণে আবার হুগলির আকাশ-বাতাস মাতিয়ে দিয়ে বেজে উঠল সেই অদ্ভুত সুর, সেই অদ্ভুত চনমনে বাজনা আর আমরা সব ভুলে গরাদ-দেওয়া জানলা থেকে জ্যোৎস্নায় ভেসে যাওয়া তলতাবাঁশের বনের দিকে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে রইলাম।

ছবি : জয়ন্ত ঘোষ

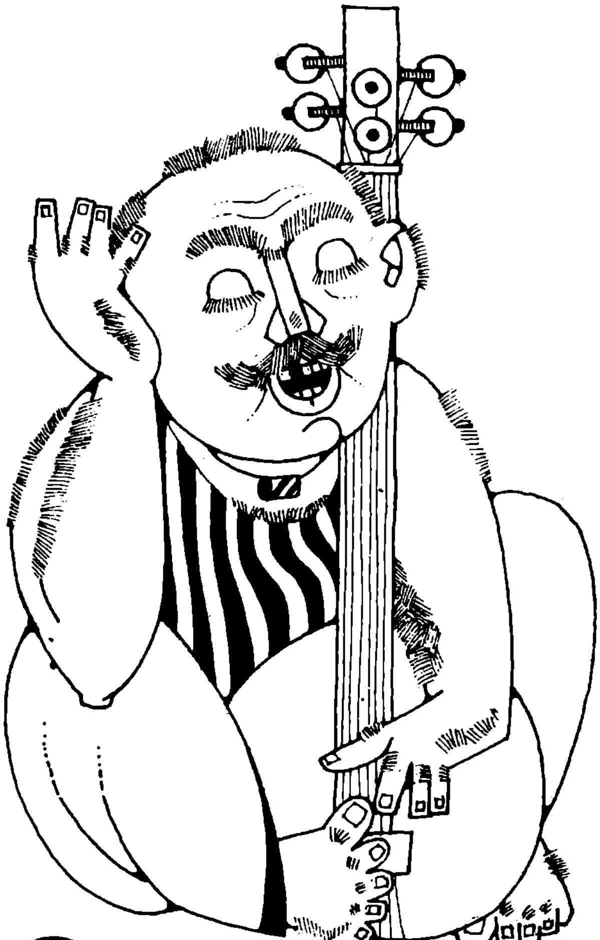

ভীষ্মলোচন

অসিত ভট্টাচার্য

ভীষ্মলোচন শর্মা তাঁহার গানটি করে শেষ
তানপুরাটি স্কন্ধে তুলে হলেন নিরুদ্দেশ।
বলে গেলেন : "এই দেশেতে হাঁপিয়ে গেলাম আমি
মিইয়ে গেল মনটা আমার সবচে যেটা দামি।
এ-দেশের এই মানুষগুলো হয় বোকা নয় বিশ্রী,
মুড়ির স্বাদ-ই জানল না তার, চিনবে কি আর মিছরি !
অরসিকের সঙ্গে পড়ে পেলাম শুধু দুঃখ,
লোকগুলো সব নেহাত বাজে, একেবারেই মূর্খ !
মুখে এদের কুলুপ আঁটা, মনের ভেতর খিল,
এরা কোথায় বুঝবে আমার কেমন দরাজ দিল !
যা হোক, অনেক দণ্ড দিলাম এইখানে গান গেয়ে,
লখ্‌নো গিয়ে করব মউজ বাদশাহি পান খেয়ে।
তার পরেতে কণ্ঠ খুলে গাইব যখন গান,
আকাশ-মাটি কাঁদবে অঝোর ! ডাকবে কোটালবান !"

ভীষ্মলোচন দৃশ্যত আর ফেরেননি এই দেশে,
নিজের গানের বানের টানে কোথায় গেছেন ভেসে।

ছবি : জয়ন্ত ঘোষ

ভোমরা

মায়া বসু

ছুট্‌কিমাসির ছোট্ট মেয়ে
নামটি যে তার ভোমরা,
পড়াশোনার কথা হলেই
মুখখানি হয় গোমড়া।
খেলতে দারুণ ভালবাসে
পড়তে মোটেই চায় না,
স্লেট-পেনসিল বই খাতা সে
হাতের কাছে পায় না।
স্কুলে যাবার সময় হলেই
রোজ পায় তার কান্না,
হোম-টাস্‌ক্ না হলে পরে
বকবেন মিস্ খান্না।
তখন করে পেটব্যথা তার,
তখন আসে জ্বর যে,
ঠাক্‌মা বলেন, "করলে এমন
জুটবে না তোর বর যে।"
রেগেমেগে বলেন বাবা,
"স্কুল না যাবার ফন্দি,
ইচ্ছেও কি করে না তোর
একটু পড়ায় মন দি?"
ছুট্‌কিমাসি বলেন হেসে,
"করছ কেন সন্দ?
জ্বর হয়েছে, আজ ভোমরার
দুপুরে ভাত বন্ধ।"

মা'কে

তীর্থঙ্কর দাস পুরকায়স্থ

ভীষণ কঠিন ঠিক করে বলা
ভালবাসি বেশি কাকে,
কখনও ভাবছি, বাবাকেই বেশি,
কখনও ভাবছি মা'কে।

বাবা খুব ভাল, যদি না মারেন
পড়ার জন্য থাপ্পড়,
গাল জুড়ে যদি কখনও না পড়ে
পাঁচ আঙুলের স্বাক্ষর।

মা'কে ভালবাসি সবচেয়ে বেশি
যখন মাছের লম্বা
ল্যাজাটা খাওয়ান, দাদা পায় যদি
কেবল অষ্টরম্ভা।

সবচেয়ে ভালবাসি নিশ্চয়,
মা'কে, নিশ্চয়, মা'কে,
নইলে লুকোই, মা যদি বকেন
তাঁরই আঁচলের ফাঁকে?

উলটো-পালটা

রানা চট্টোপাধ্যায়

বাগবাজারের কালী
সংস্কৃত শিখতে গিয়ে
শিখে এলেন পালি।

আনন্দে তাই খুড়ো
বাজার থেকে কিনে আনেন
ভেট্‌কি মাছের মুড়ো।

কেষ্টপুরের ভজা
বাঁশি বাজায়, আন্দুলে যায়
কিনতে জিবেগজা।

খুড়ো বলেন দেখে,
আমি কিসে কম্‌তি আছি?
মিষ্টি খাবে কে কে?

খুড়োর বড়মাসি
উলটো-পালটা কাণ্ড দেখে
পালিয়ে গেলেন কাশী।

ছবি : দেবাশিস দেব

ছায়ামূর্তির হাত থেকে লাঠি পড়ে গেল

কীর্তিনাশা রজনীবাবু

বাণীব্রত চক্রবর্তী

সবে এক কাপ চা খেয়ে সিগারেট ধরিয়েছেন। আজকের কাগজটাও দেখা হয়নি, এমন সময় হরি এসে বলল, "বাবু, আপনার সঙ্গে একজন দেখা করতে চান।"

রজনীবাবু অবাক হলেন। এই সাতসকালে কে আবার তাঁর সঙ্গে দেখা করতে চায়! বাবুর বিস্ময়ভাব লক্ষ করে হরি বলল, "একজন বুড়োমানুষ! বললেন অনেক দূর থেকে আসছেন।"

হরির সঙ্গে এক জরাজীর্ণ বৃদ্ধ ঘরে ঢুকলেন। রজনীবাবু ব্যস্তসমস্ত হয়ে তাঁকে আপ্যায়ন করলেন। চেয়ারে বসেও ভদ্রলোক হাঁপাচ্ছিলেন। হাঁপাতে-হাঁপাতে হাত জোড় করে বললেন, "আমার নাম চরণদাস মুখুজ্জে। আসছি মেদিনীপুরের সাতমাইল থেকে।"

হরি ততক্ষণে চা নিয়ে এসেছে। চরণদাস মুখুজ্জে একগাল হেসে বললেন, "লেখকরা অন্তর্যামী। এতদিন শুনে এসিছি। এখন বুঝছি কথাটা মিথ্যে নয়। এক কাপ চা চাইছিলুম।"

রজনীবাবু হেসে ফেললেন, "আমার সেবক শ্রীমান হরিহরকে অন্তর্যামী বলুন।" বৃদ্ধ অট্টহাস্য করে চায়ের কাপ তুলে নিলেন। রজনীবাবু দেখলেন চরণদাস মুখুজ্জে পরম তৃপ্তিতে চা খাচ্ছেন। চা শেষ করে হাত বাড়িয়ে বললেন, "দিন একটা সিগারেট দিন।" সিগারেট ধরিয়ে চরণদাস মুখুজ্জে বললেন, "বঙ্কিমচন্দ্রের কপালকুণ্ডলার স্পটটা চেনেন? ঐ আমাদের সাতমাইলের কাছাকাছি। আপনাকে একবার সেখানে যেতে হবে।"

ভদ্রলোক চুপ করে সিগারেট টানতে থাকেন। মুখে হাসি। রজনীবাবু বললেন, "কী ব্যাপার বলুন তো? ভূতের গল্প লিখি বলে আমাকে অনেকে ভুতুড়ে লেখক বলেন। তাই সভা-টভা থেকে আমার ডাকও আসে না। কালেভদ্রে যদি ডাক আসে তাহলেও আমি যাই না। ওসব সভা-সমিতি আমার ঠিক ধাতে আসে না। তাই বলছিলুম ওই সভা-টভা নয় তো?"

চরণদাস তক্ষুনি কোনো জবাব দিলেন না। চুপ করে সিগারেট টানতে লাগলেন। দু-একবার কেসে উঠলেন। তারপর যেন চিন্তার সমুদ্র থেকে ক্রমোত্থিত হয়ে বললেন "আপনি নবীন সেনের 'কীর্তিনাশা' পড়েছেন? সেই যে কবি লিখছেন— 'কীর্তিনাশা! কিবা নাম, কিবা অভিমান!/পার তুমি মানবের কী কীর্তি নাশিতে?' রাজা রাজবল্লভের গগনচুম্বী রাজপ্রাসাদ গ্রাস করার পর লোকে পদ্মাকে কীর্তিনাশা বলতে আরম্ভ করল। কিন্তু মশাই, পদ্মার এই অভিমান যে কত ঠুনকো, একটু ভেবে দেখলেই বুঝতে পারা যায়। মানুষের সত্যকার কীর্তি নষ্ট করার সাধ্য কি পদ্মার আছে?"

চরণদাস মুখুজ্জে থামলেন। সিগারেটে টান দিয়ে এবার

ঈষৎ গম্ভীর স্বরে বললেন, "রাজা প্রাণকৃষ্ণের প্রাসাদকেও নদী গ্রাস করছে। কিন্তু আত্মার কোনো ক্ষয় নেই। আজও সেই ভগ্ন প্রাসাদে লাঠি হাতে রাজা প্রাণকৃষ্ণ ঘুরে বেড়ান। তবে হ্যাঁ, কেবল কৃষ্ণপক্ষের মধ্যরাত্রে।"

রজনীবাবু হাসি চাপতে পারলেন না। নিশ্চয়ই বৃদ্ধের মাথায় ছিট আছে। বৃদ্ধ বিরক্ত হলেন, "আপনি হাসছেন? ধিক্, আপনার সাধনা। আপনি না ভূতের গল্প লেখেন? দু-পাতা-ইংরিজি-পড়া আজকের অর্বাচীনদের সঙ্গে তবে তো আপনার কোনো পার্থক্য নেই।"

রজনীবাবু লজ্জা পেলেন। বললেন, "কিছু মনে করবেন না। সবই বুঝলুম। কিন্তু শুধু ওইটুকু বুঝলুম না। রাজা প্রাণকৃষ্ণের আত্মা লাঠি হাতে ঘুরে বেড়ান কেন?"

এবার বৃদ্ধকে অনেকটা প্রশমিত মনে হয়। বৃদ্ধ চরণদাস হাত বাড়ালেন। রজনীবাবু সিগারেট এগিয়ে দিলেন। সিগারেট ধরিয়ে বৃদ্ধ বললেন, "আর এক কাপ চা পাওয়া যাবে কী?"

রজনীবাবু শশব্যস্ত হয়ে বললেন, "নিশ্চয়ই। নিশ্চয়ই।" হরিকে ডাকার সঙ্গে-সঙ্গেই সে হাজির। তার হাতের ট্রেতে দু-কাপ চা, প্লেটে রসগোল্লা আর নিমকি।

চরণদাস মুখুজ্জে মাথা নাড়তে নাড়তে বললেন, "আপনি ঠিকই বলেছেন। আপনার সেবক সত্যিই অন্তর্যামী।"

বৃদ্ধ বললেন, "মিষ্টি খাওয়া বারণ। তবে নিমকি খেতে পারি।"

চা-টা খাওয়ার পর চরণদাস কথা শুরু করলেন, "রাজা প্রাণকৃষ্ণ ঠিক কোন্ আমলের মানুষ ছিলেন তা নিশ্চিত করে বলা একটু কঠিন। সম্ভবত তখনও এদেশে ইংরেজ আসেনি। কিংবা সবে এসেছে। লোকমুখে শোনা যায় রাজার শেষ জীবনটা ভয়াবহ। পুত্ররা পরস্পরের মধ্যে কলহ-বিবাদ শুরু করেছিল। সেই বিবাদ শেষ পর্যন্ত সংঘর্ষে রূপ নেয়। হ্যাঁ, যাকে বলে রক্ত-রুধির সংঘর্ষ। অবশেষে রাজার মধ্যম পুত্র অন্যান্য ভ্রাতাদের নিহত করে এবং পিতাকে বন্দী করে। ততদিনে রাজা প্রাণকৃষ্ণ দুরারোগ্য চক্ষুব্যাধিতে সম্পূর্ণ অন্ধ হয়ে গেছেন। অন্ধ রাজা অবশেষে, পুত্রের বন্দীশালায় শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন।"

বৃদ্ধ থামলেন। তারপর দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, "অদ্ভুত গল্প না? ঠিক যেন শাজাহানের কাহিনী।" দুজনে পরস্পরের দিকে চেয়ে স্তব্ধভাবে বসে রইলেন।

স্তব্ধতা ভঙ্গ করলেন চরণদাস মুখুজ্জে, "আপনি কি দেখতে চান রাজা প্রাণকৃষ্ণের আত্মাকে? ভগ্ন প্রাসাদের অলিন্দে অলিন্দে অন্ধ রাজার প্রেত লাঠি ঠুকে-ঠুকে ঘুরে বেড়াচ্ছে, এই দৃশ্য দেখতে চান রজনীবাবু?"

॥ দুই ॥

অকৃতদার চরণদাস গ্রামের একপ্রান্তে ছোট্ট একটি মাঠকোঠায় থাকেন। নিজের কিছু জায়গাজমি আছে, তাতেই তাঁর একরকম চলে যায়। বৃদ্ধ চরণদাস প্রেততত্ত্বে বিশ্বাসী। কর্নেল অলকট, মাদাম ব্লাভাটস্কির প্রতি তাঁর গভীর শ্রদ্ধা। তিনি গ্রামের মানুষ এবং সেকালের মানুষও বটে। কিন্তু তাহলে হবে কী, ভদ্রলোক নিজের চেষ্টায় আই এ পর্যন্ত পড়েছেন। রাত্রি বেলায় এই বুড়ো বয়সেও বনেবাদাড়ে ভগ্ন দেউলে হানাবাড়িতে ঘুরে ঘুরে প্রেতের সন্ধান করেন। এই সন্ধান করতে করতেই তিনি রাজা প্রাণকৃষ্ণের ভগ্ন প্রাসাদে রাজার প্রেতমূর্তি দেখতে পান।

লাঠি হাতে অন্ধ রাজা ভগ্ন প্রাসাদের অলিন্দে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। কলকাতায় একজন ভূতপাগল মানুষ আছেন। তিনি রজনীবাবু। এই রজনীবাবুকে রাজার প্রেতমূর্তি দর্শন করাবেন। বৃদ্ধ বলেছিলেন, "আপনাকে নেওয়ার জন্যেই এত দূরে ছুটে আসা।"

রজনীবাবু সেইদিনই বৃদ্ধ চরণদাসের সঙ্গে রওনা হয়ে গেলেন। কলকাতা থেকে বেশি দূর তো নয়। এখন কৃষ্ণপক্ষ চলছে। এই সময় রাজার প্রেতাত্মা দেখতে পাওয়া যায়। প্রথম দুদিন গল্পগুজবে কাটল। তৃতীয়দিন মধ্যরাত্রিতে উভয়ে সেখানে যাবেন ঠিক হল। চরণদাসের বাড়ি থেকে রাজার প্রাসাদ দূরে নয়। একদিন সকালে দুজনে মিলে ঘুরে আসা যায়। প্রাসাদের অনেক দূরে দাঁড়িয়ে বৃদ্ধ আঙুল তুলে দেখিয়েছেন, "ওই যে নদীর ধারে ওই সেই প্রাসাদ।" আর এগোননি।

বৃদ্ধ বলেছিলেন, "সকালে গেলে সমস্ত ব্যাপারটার চার্ম নষ্ট হয়ে যাবে।"

আজ সেই কৃষ্ণপক্ষের তিমিররাত্রি। রজনীবাবু রাজা প্রাণকৃষ্ণের ভগ্ন প্রাসাদের উদ্দেশে রওনা হলেন। বৃদ্ধ চরণদাস যেতে পারলেন না। বাধ সাধল বৃদ্ধের শরীর। সন্ধে থেকেই বৃদ্ধ কাহিল হয়ে পড়লেন। এটা অবশ্য একদিক দিয়ে রজনীবাবুর পক্ষে ভালই হল। রজনীবাবু চরণদাস মুখুজ্জেকে সঙ্গে না পেয়ে খুশি হলেন। বৃদ্ধ এলে সমস্ত ব্যাপারটা তালগোল পাকিয়ে যাবে, এ-ব্যাপারে রজনীবাবু নিশ্চিত! চরণদাসবাবুর মতো সহজ-সরল মানুষ আজকের দিনে সচরাচর দেখতে পাওয়া যায় না। তাঁর সরল চিত্ত যাঁকে রাজার প্রেতাত্মা বলে সাব্যস্ত করেছে তিনি কি রাজা প্রাণকৃষ্ণের প্রেতাত্মা? রজনীবাবু বুঝতে পেরেছিলেন ব্যাপারটির ভিতর বেশ গোলমাল আছে।

রহস্য রজনীবাবুকে হাতছানি দিয়ে ডাকল। রজনীবাবু একাই গভীর রাত্রিতে রাজার ভগ্ন প্রাসাদে এসে উপস্থিত হলেন।

রজনীবাবু সিগারেট ধরাবেন কি না ভাবছিলেন। এমন সময় খট-খট শব্দ শুনতে পেলেন। সিগারেট-দেশলাই পকেটে পুরে তিনি ভাঙা সিঁড়ির উপরে চুপ করে বসে রইলেন। শব্দটা দূর থেকে এদিকেই এগিয়ে আসছিল। রজনীবাবু বুঝতে পারলেন কেউ লাঠি ঠুকে-ঠুকে এগিয়ে আসছে। হঠাৎ শব্দটা থেমে গেল। চারদিকে গভীর অন্ধকার এবং স্তব্ধতা। কৃষ্ণপক্ষের রাত বলে অন্ধকার এত গাঢ়। রজনীবাবু সন্তর্পণে বাঁ হাতের কব্জি চোখের সামনে তুলে ধরলেন। রেডিয়ামের নীলাভ আলোয় দেখলেন দুটো বেজে দশ। রজনীবাবু চারপাশটা ভালভাবে নিরীক্ষণ করলেন। ভগ্ন প্রাসাদের বিধ্বস্ত প্রাকার এবং জীর্ণ স্তম্ভগুলির অবস্থিতি ছাড়া আর যা নজরে পড়ে তা অন্ধকার ছাড়া অন্য কিছু নয়।

তিনি ভিতরে ভিতরে খুব অস্থির বোধ করছিলেন। অস্থিরতা ক্রমশ বাড়ছিল। কেননা যখনই তিনি কোনো ব্যাপারে চঞ্চল হয়ে ওঠেন তখন ঘন ঘন সিগারেট খান। এখন সে উপায় নেই। কতক্ষণ এইভাবে বসে থাকতে হবে সেটা

জানা নেই। এসেছেনও ঘণ্টা-দেড়েক হল। রজনীবাবু মনে করতে পারলেন না তাঁর বাহান্ন বছরের জীবনে ঠিক এইরকম কোনো পরীক্ষায় তাঁকে পড়তে হয়েছে কি না। যতদূর মনে হয় এইরকম পরীক্ষা জীবনে এই প্রথম। এমন অন্ধকার ধ্বংসস্তূপের ভেতর চতুর গোয়েন্দার মতন ঘাপটি মেরে থাকা এর আগে ঘটেনি।

লাঠি ঠুকে-ঠুকে কেউ যেন এইদিকে এগিয়ে আসছিল। হঠাৎ শব্দটা থেমে গেছে। রজনীবাবু চুপ করে বসে আছেন। মিনিট-পনেরো পরে আবার শব্দ শোনা গেল। শব্দ আর এগিয়ে আসছে না। যে লাঠি ঠুকতে ঠুকতে এগিয়ে আসছিল সে ফিরে যাচ্ছে।

রজনীবাবু আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়ালেন। যেদিক থেকে শব্দ আসছিল সেদিকে তাকালেন। প্রাসাদের অন্ধকার অলিন্দ। কিছুই দেখা যাচ্ছে না। ওপাশে নদীর জলের শব্দ শোনা যাচ্ছে। এইভাবে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকার পর রজনীবাবু আবার সেই শব্দ শুনতে পেলেন। খট-খট শব্দ। এবার শব্দটা আসছে পিছন দিক থেকে। রজনীবাবু পিছন ফিরলেন। আর তখনই অদূরে একটি ছায়ামূর্তি দেখতে পেলেন। হাতে লাঠি। রজনীবাবু মুহূর্তে পকেট থেকে টর্চ বার করে বোতাম টিপলেন। ছায়ামূর্তির হাত থেকে লাঠি পড়ে গেল। মূর্তির গায়ে কালো আলোয়ান। ভগ্ন প্রাসাদের মেঝেতে বসে পড়ে ছায়ামূর্তি ডুকরে কেঁদে উঠল। রজনীবাবু ছুটে গিয়ে বৃদ্ধ চরণদাসকে হাত ধরে টেনে তুললেন। তারপর তাঁকে বললেন, "কাঁদবেন না। চলুন, বাড়ি ফেরা যাক।"

॥ তিন ॥

চরণদাস মুখুজ্জে হাত বাড়িয়ে রজনীবাবুর কাছ থেকে সিগারেট নিলেন। দুজনে সিগারেট ধরালেন। দুজনে চুপচাপ সিগারেট টানতে লাগলেন। নীরবতা ভাঙলেন রজনীবাবু। রজনীবাবু বললেন, "প্রথম থেকেই ব্যাপারটাতে আমার খটকা লেগেছিল। মনে হয়েছিল আপনার মতন সহজ-সরল মানুষকে কেউ ঠকাচ্ছে। দেশের ইতিহাসটা মোটামুটি পড়া আছে। কই, ইতিহাসে রাজা প্রাণকৃষ্ণের কথা তো পাইনি। কথা কেন, ক্ষীণতম আভাসও পাইনি। সুতরাং, রাজা প্রাণকৃষ্ণের প্রাসাদটা একবার দেখতে হয়। নিজের চোখে রাজার প্রেতাত্মা দেখতে হবে। অতএব মনে মনে 'জয় দুর্গা' বলে কলকাতা থেকে আপনার সঙ্গে রওনা হলুম। সঙ্গে-সঙ্গে নিজেকে বারবার বললুম, রজনী, এবার তোমার অন্য ভূমিকা। ভুতুড়ে লেখক থেকে সত্যান্বেষী গোয়েন্দা।"

বৃদ্ধের চোখে-মুখে এখনও অপরাধবোধের লজ্জা। এখনও তিনি সহজ হতে পারেননি। রজনীবাবু বারবার বলছেন, "আপনার লজ্জা আমাকেও লজ্জিত করছে। আপনি স্বাভাবিক হোন।" কিন্তু কালকের রাতের ঘটনার পর থেকে বৃদ্ধ এমন সংকুচিত হয়ে আছেন।

এখন কিঞ্চিৎ লজ্জা কাটিয়ে বৃদ্ধ বললেন, "তাহলে সব কথা খুলে বলি। যতক্ষণ না সব ব্যক্ত করতে পারছি ততক্ষণ স্বস্তি নেই। সারা জীবন প্রেতাত্মার অনুসন্ধান করতে করতে অবশেষে মরিয়া হয়ে উঠলুম। কই, কোথায় প্রেত ? তবে কি আত্মা মিথ্যা ? আত্মা যদি মিথ্যা হয়, ঈশ্বরও মিথ্যা। আমাদের শাস্ত্র মিথ্যা। থিয়োজফি মিথ্যা। একদিন ঘুরে বেড়াতে বেড়াতে অকস্মাৎ নদীতীরের জমিদারবাড়ি আমার টনক নড়াল। আপনার কথা মনে পড়ল। সংকল্প করলুম আমিই প্রেতের ভূমিকা গ্রহণ করব। রজনীবাবুকে শিহরিত করব। তাঁকে যদি নকল ভূত দেখিয়ে চমকে দিতে পারি তাহলেই আমার জয়। কিন্তু রজনীবাবু, আমি মূর্খ, আজ বুঝলুম সত্যের জয় অনিবার্য। সত্যকে কেউ কখনও কোনোদিন পরাজিত করতে পারে না।"

বৃদ্ধ চুপ করলেন। রজনীবাবু দেখলেন চরণদাস মুখুজ্জের চোখে অশ্রু চিক্‌চিক্ করছে।

রজনীবাবু আবার একটা সিগারেট ধরালেন।

ছবি : প্রবীর সেন

কাছে, আরো কাছে পেতে—ক্লোজ-আপ

এই অলস, কুয়াশাঘেরা, পাগল করা গ্রীষ্মের সন্ধ্যাবেলা...হাসিখেলা ভাগ ক'রে নিয়ে, মুখর, গুঞ্জনে ভরা বেলা—আর এই মিলন-খেলায় মেতে উঠতে আপনার মধ্যে আছে ভরপুর আত্মবিশ্বাস—ক্লোজ-আপের আত্মবিশ্বাস!

স্বচ্ছ লাল ক্লোজ-আপের অতি সাদা করার দুটি বিশেষ উপাদান দিয়ে আপনার দাঁত হয় সবচেয়ে সাদা আর এর বিশেষ মাউথওয়াশ দিয়ে আপনার নিঃশ্বাস হয় সবচেয়ে তাজা!

তাই ক্লোজ-আপের হাসি হাসুন আর আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে কাছে, আরো কাছে আসুন—কারণ, ক্লোজ-আপ যে শুধু কাছে, আরো কাছে পাওয়ার জন্যেই!

হিন্দুস্থান লিভারের উৎকৃষ্ট উৎপাদন

LINTAS CX 59 2619 BG

একাধারে টুথপেস্ট আর মাউথওয়াশ

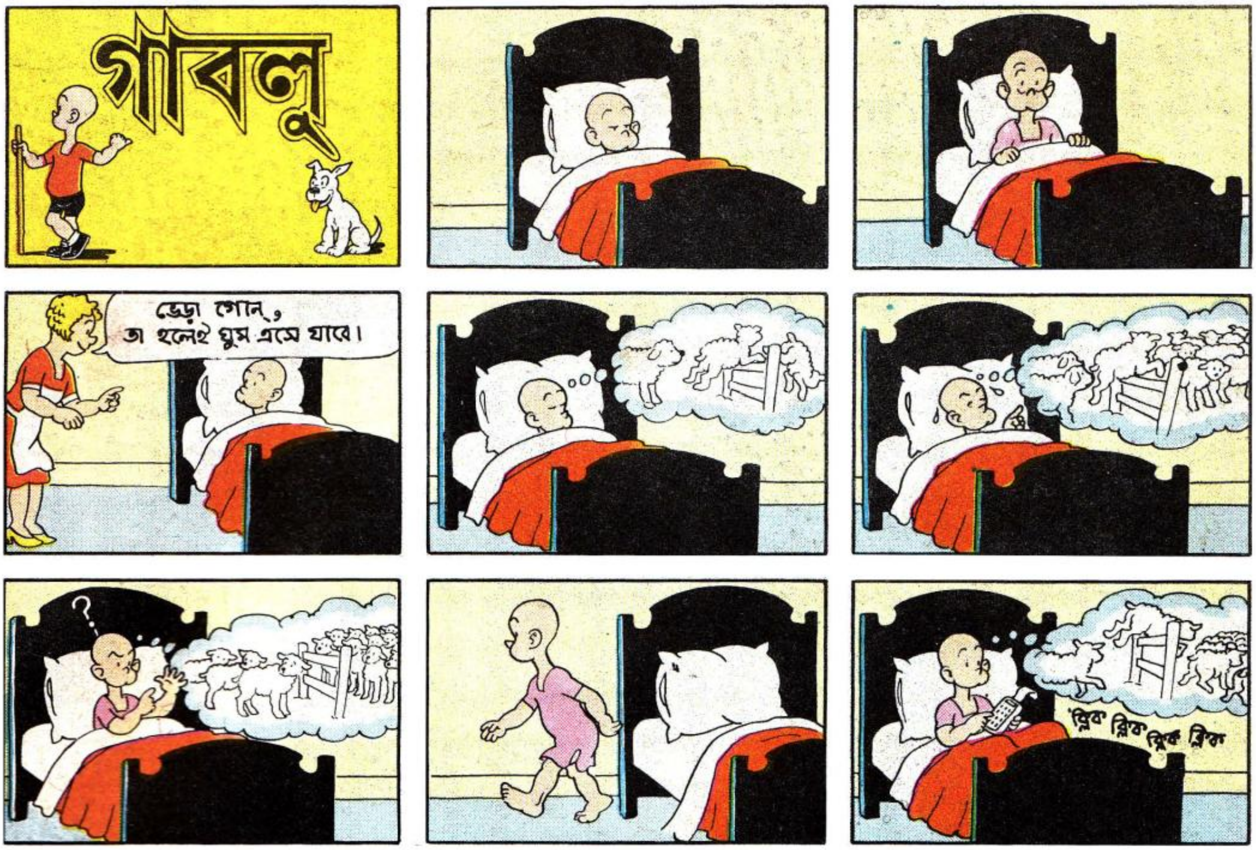
গাবলু
ভেড়া গোনো, তা হলেই ঘুম এসে যাবে।
ক্লিক ক্লিক ক্লিক ক্লিক

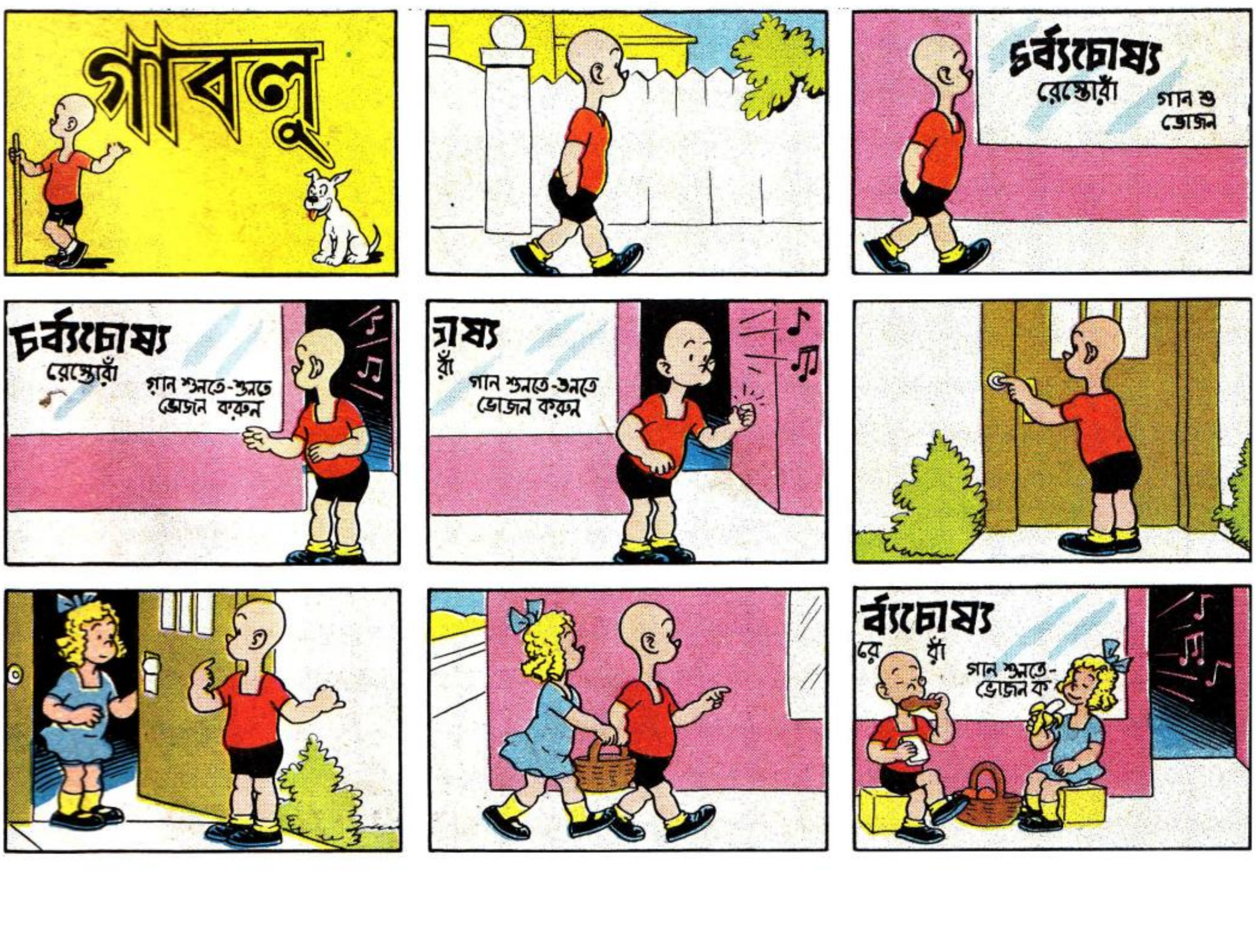
গাবলু
চর্ব্যচোষ্য
রেস্তোরাঁ
গান শু
ভোজন
চর্ব্যচোষ্য
রেস্তোরাঁ
গান শুনতে-শুনতে ভোজন করুন
গান শুনতে-শুনতে ভোজন করুন
র্ব্যচোষ্য

ফুটবলের কলকাতা

সুজয় সোম

মে মাসের মাঝামাঝি থেকে সেপ্টেম্বরের শেষাশেষি—ষোলো আউন্স ওজনের, সাতাশ থেকে আটাশ ইঞ্চি পরিধির বৃত্তাকার, হাওয়া দিয়ে ফোলানো-ফাঁপানো একটা চামড়ার বলকে ঘিরে মেতে ওঠে কলকাতা। বিকেল শুরুর মুখেই মহানগরীর সব রাস্তা হুড়মুড় করে পৌঁছে যায় ময়দানের তিন ঘেরা-মাঠের কোনও একটাতে। অঙ্কস্যারের মতো মেজাজি রোদ তখন হয়তো গায়ে হুল ফোটাচ্ছে, ফ্যাসফ্যাসে গরমে চুপসে গেছেন সকলে। কিংবা হয়তো দমকা হাওয়া, ঝড়ের মাতামাতি, আকাশ-ভাঙা বৃষ্টি। সব কিছু তুচ্ছ করে আইঢাই প্রাণ, উড়ুউড়ু মন নিয়ে বাইশটা লোকের লাথালাথি দেখা! হুটোপুটি, টানাপোড়েনের ফাঁকে দু-দলের খেলোয়াড়েরই চেষ্টা শত্রু-শিবিরের ডিফেন্স টপ্‌কে ওই তে-খোঁটার ভেতরে বলটাকে ঢুকিয়ে দেওয়া যায় কেমন করে!

খেলা দেখে ফেরার পথে বাসে-ট্রামে, তারপর গলির মোড়ে বা রকে, বৈঠকখানায়, চায়ের দোকানে গুলতানি। পরের দিন ভোরবেলা ঘুম থেকে উঠে, চোখে-মুখে জল দিয়েই খবরের কাগজের খেলার পাতায় হুমড়ি। সকাল, দুপুর গড়িয়ে ফের বিকেল এসে গেল, কলকাতা ওই ফুটবলেই মাতোয়ারা। ইশকুল-কলেজে, আপিসে-আদালতে, রেস্তোরাঁয়, কফি হাউসে। হৈ-চৈ, হুল্লোড়, হাতাহাতি। জল্পনা-কল্পনার একশেষ!

ফুটবল খেলার শুরু ইংল্যাণ্ডে। এই খেলা দেখার নেশাতেও প্রথম মজেছিলেন ওদেশের সাধারণ মানুষই। অবিশ্যি আঠারোশো চুয়ান্ন সালের মাঝ-এপ্রিলে যখন এদেশে ফুটবলের বীজ ছড়ালেন কলকাতার ইংরেজরা, তখনও বিলেতে খেলাটা নিছকই র‍্যাবল্ বা ফালতু আদমিদের। জাতে উঠতে দেরি হল না। ক-দিন পরে ভারতেও—উনিশ শতকের শেষের দিকে। আঠারোশো চুরাশি সালে প্রেসিডেন্সি কলেজে বাঙালিরা প্রথম ফুটবল খেললেন। সাত বছর বাদে, বিরানব্বুই সালে ভেতো বাঙালি-দল শোভাবাজার ট্রেডস কাপ প্রতিযোগিতায় এক গোরা-পল্টন দলকে হারিয়ে দিল। সেই প্রথম বাঙালিরা নাজেহাল করলেন ব্রিটিশ ফুটবলারদের। তারপর একগাদা ছোটখাটো জয় পেরিয়ে এসে গেল উনিশশো এগারো সাল। খালি পায়ে পাঁচটা সায়েব-দলকে ঘায়েল করে আই· এফ· এ· শিল্ড জিতল মোহনবাগান। পরাধীন মানুষ ইংরেজদের সঙ্গে যুদ্ধে জেতার স্বাদ পেলেন ফুটবল মাঠে।

তখন ইডেন গার্ডেন্স, উট্রাম ঘাট, গড়ের মাঠ, চৌরঙ্গি অঞ্চল সায়েব-মেমদের খাস এলাকা। আপিসে-আদালতেও বড়, মেজো, সেজো, ছোট সায়েবদের দাপট। হাঁপিয়ে ওঠা বাঙালিদের মন-প্রাণ মুক্তি পেল ফুটবল খেলায়। তা বলে এগারো সালের 'দুর্ঘটনা' যাতে ফের না ঘটে, ইংরেজদের সেদিকে কড়া নজর।

সায়েবরা খেলতেন অনেক সময়েই চোদ্দজনে! তার মধ্যে তিনজন বিচারক। রেফারি, দুই লাইন্সম্যান। নেটিভরা গোল করলে অফসাইড, ফাউল বা হ্যাণ্ডবলের অজুহাত! সায়েবরা কোনওরকমে গোলে বল ঢোকালেই রেফারির ঠোঁটের বাঁশি বেজে উঠত! লাইন্সম্যানের ফ্ল্যাগ চুরি করল একের পর এক কর্নার, খামোকা নির্দেশ দিল অফসাইডের। মোহনবাগানের শিল্ড বিজয়ের তিন বছর পরে কলকাতার ফুটবল লিগের নানা বিভাগে জায়গা পেল ভারতীয় দলগুলো। তারপরেও বহুদিন প্রথম বিভাগে দুটোর বেশি ভারতীয় দলকে খেলতে দেওয়া হল না। সব ছাপিয়ে গড়ের মাঠের ফুটবল-মরসুম বাঙালিদের এক বড় মাপের জাতীয় উৎসব, সেই কবে থেকে! পানসে জীবনযাপনের মধ্যে এক-দেড় ঘণ্টার মার-মার কাট-কাট, টগবগে উত্তেজনায় ডগমগ হতে ভালবাসে কলকাতা। লাগামছাড়া মজা, আনন্দ, খুশি। অস্বীকার করা যাবে না, যে যুগে গোষ্ঠ পাল ফুটবল খেলতেন, সেই যুগের সবচেয়ে বিখ্যাত, জনপ্রিয় বাঙালি ছিলেন তিনিই!

সাধারণ মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষা, স্বপ্নকে ফিরে ফুটবল মাঠে ইংরেজদের সঙ্গে যুদ্ধে মোহনবাগানকে মদত দিতে একে একে এগিয়ে এল আরও কয়েকটা ভারতীয় দল। কুমারটুলি, এরিয়ান্স, জোড়াবাগান, স্পোর্টিং ইউনিয়ন, টাউন, মহমেডান স্পোর্টিং, ইস্টবেঙ্গল। লিগে ইস্টবেঙ্গল-মোহনবাগানের লড়াইয়ে আজকের যে স্নায়ুযুদ্ধ বা রেষারেষি, তার শুরু উনিশশো পঁচিশ সালের আটাশে মে। লেফট আউট নেপাল চক্রবর্তীর গোলে ইস্টবেঙ্গল জিতেছিল। কেন যে এই দুই দলের খেলাকে প্রথম থেকেই ঘটি-বাঙালের যুদ্ধ বলা শুরু হয়েছিল, আজও তা রহস্যময়! গোষ্ঠ পাল, তারক শূর, সুধাংশু বসুর মতো কট্টর বাঙালরাই তখন মোহনবাগানের তুরুপের তাস। এদিকে ইস্টবেঙ্গলের ডাকসাইটে গোলরক্ষক পূর্ণ দাশ খাঁটি ঘটি।

শাবাশ ভারত

অশোক রায়

কদিন আগে বেনসন অ্যাণ্ড হেজেস কাপে চ্যাম্পিয়ান হবার পরে ভারত যখন শারজায় রথম্যান্‌স কাপে খেলতে গেল, তখন দাবি উঠেছিল, 'রথম্যান্‌স কাপটাও চাই'। স্বাভাবিক দাবি। কিন্তু এক নম্বর হওয়া যতটা শক্ত, এক নম্বরে অধিষ্ঠিত থাকা তার চেয়ে কম কঠিন নয়। ক্যাপ্টেন কপিল শক্ত কাজটা শেষ করলেন সহজেই। শাবাশ কপিল, শাবাশ ভারত। এই খেলার ফলাফলের কথা আগের সংখ্যাতেই ছিল। এবারে বিস্তারিত বিবরণ দিচ্ছি।

পাকিস্তানের বিরুদ্ধে প্রথম ম্যাচেই ভারত মুখোমুখি হয় ইমরান খানের। ইদানীং পয়লা নম্বর শত্রু হিসেবে যিনি ভারতীয়দের ক্রমাগত উত্ত্যক্ত করেছেন ফাস্ট বোলিংয়ের দাপটে। 'বিস্ময়-বালক' আজহারের ৪৭ এবং অধিনায়ক কপিলের ৩০ রান সত্ত্বেও ভারত শেষ হয় মাত্র ১২৫ রানে। বিশ্বজয়ীর ব্যাটিং আমাদের বাধ্য করল সভয়ে চোখ বুজে হরিনাম জপতে। পীড়াদায়ক স্কোরবোর্ডটি তখন ফলাও করে সাজিয়ে রেখেছে শাস্ত্রী, শ্রীকান্ত, গাওস্কর, বেংসরকর, মহিন্দরসহ ১৪ রানে ৬ উইকেট নেবার কীর্তি। ভারত ঝলসে গেল ইমরানের উত্তাপে। 'ভয়ঙ্কর', 'দুর্ধর্ষ', 'বিধ্বংসী', 'মারাত্মক' শব্দগুলো নিয়ে নাড়াচাড়া করার পরে মনে হওয়া স্বাভাবিক, ইমরানের ওই তাণ্ডব বোলিংয়ের সঠিক বিশেষণ এগুলি নয়। ১৯৮২-৮৩ সিরিজে ইমরানের দুর্ধর্ষ বোলিং একদা যেসব বিশেষণের দ্বারা সমাদৃত হয়েছিল, রথম্যান্‌স কাপের অবিশ্বাস্য খুনে-মেজাজের বোলিংকে স্বীকৃতি জানাতে সেই একই বিশেষণের পুনঃ-প্রয়োগ করতেই হচ্ছে, কী আর করা যাবে।

তবে আসল খেলা বাকি ছিল। ইমরানকে সামনে রেখে পাকিস্তানিরা যখন ম্যাচ জেতার আনন্দ নিয়ে প্যাভিলিয়ানে ফিরছিলেন, আসল লড়াই শুরু সেখান থেকেই। ড্রেসিংরুমে কপিলের ছোট্ট প্রেরণাদায়ী বক্তৃতা ম্রিয়মাণ ভারতীয়দের চাঙ্গা করে তোলে

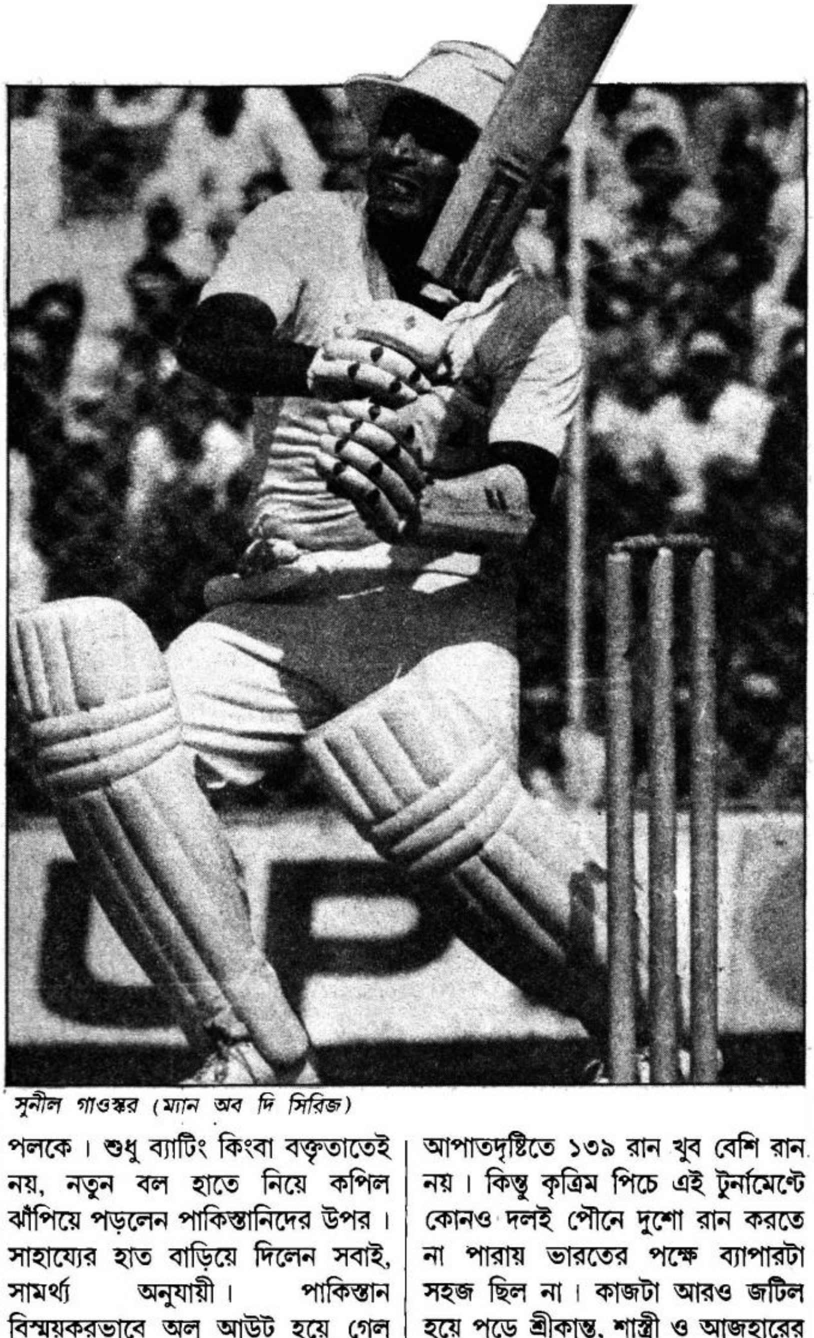

সুনীল গাওস্কর (ম্যান অব দি সিরিজ)

পলকে। শুধু ব্যাটিং কিংবা বক্তৃতাতেই নয়, নতুন বল হাতে নিয়ে কপিল ঝাঁপিয়ে পড়লেন পাকিস্তানিদের উপর। সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিলেন সবাই, সামর্থ্য অনুযায়ী। পাকিস্তান বিস্ময়করভাবে অল আউট হয়ে গেল মাত্র ৮৭ রানে। সেনাপতি কপিল বোলিংয়েও সর্বাধিক সাফল্য পেলেন ৩০ রানে তিন উইকেট নিয়ে। প্রাক্তন অধিনায়ক তালুবন্দী করলেন চারটি কঠিন ক্যাচ। ভারত ফাইনালে উঠল ৩৮ রানে জিতে।

ওদিকে দুর্বল ইংল্যাণ্ডকে হারিয়ে অস্ট্রেলিয়া উঠল ফাইনালে। টস জিতে ভারত ব্যাট করতে পাঠায় অস্ট্রেলিয়াকে। কিন্তু প্রাথমিক সাফল্য পাওয়া সত্ত্বেও অস্ট্রেলিয়া মাত্র ১৩৯ রানে খতম হয়ে যায় ভারতীয়দের নিয়ন্ত্রিত বোলিংয়ের চাপে, এবং তৎপর ফিল্ডিংয়ের গুণে। মদনলাল, শাস্ত্রী ও মহিন্দর পান দুটি করে উইকেট। আপাতদৃষ্টিতে ১৩৯ রান খুব বেশি রান নয়। কিন্তু কৃত্রিম পিচে এই টুর্নামেণ্টে কোনও দলই পৌনে দুশো রান করতে না পারায় ভারতের পক্ষে ব্যাপারটা সহজ ছিল না। কাজটা আরও জটিল হয়ে পড়ে শ্রীকান্ত, শাস্ত্রী ও আজহারের বিদায়ে। অবস্থা সামলাতে দুই অভিজ্ঞ ক্রিকেটার বেংসরকর ও গাওস্কর সক্রিয় হয়ে ওঠেন। কিন্তু গাওস্কর রান আউট হতেই ভারতীয় ইনিংসে দাঁত বসিয়ে দেবার সুযোগ পান অস্ট্রেলিয়ান বোলাররা। ১২০ রানে ঝপাঝপ পড়ে যায় ৭ উইকেট। এই রুদ্ধশ্বাস পরিস্থিতিতে মহিন্দর ও মদনলাল বিচক্ষণতার সঙ্গে খেলে জয়ের দরজায় পৌঁছে দেন ভারতকে। ভারত জেতে চৌষট্টি বল বাকি থাকতেই। ব্যাটে বলে পারদর্শিতা দেখাবার কারণে মহিন্দরের 'ম্যান অব দি ম্যাচ' নির্বাচন খুবই যুক্তিযুক্ত হয়েছে। 'ম্যান অব দি সিরিজ' হিসেবে মনোনীত হয়েছেন গাওস্কর।

ক্লিয়ারাসিল তুলোর পরীক্ষা করে দেখুন। তেল আর ময়লা দেখছেন তো? এর জন্যই তো ব্রণ হ'তে পারে।

ক্লিয়ারাসিল মেডিকেটেড ক্লেনজার লুকোনো তেলও ময়লা বার করে দিয়ে, মুখমণ্ডলে যে ত্বকের সমস্যার উদ্ভব হয় তা প্রতিরোধ করতে সাহায্য করে

তেলতেলে ত্বক ব্রণ হবার মুখ্য কারণ

তেলতেলে ত্বক ধুলোবালি আকর্ষণ করে বলে লোমকূপের মুখ বন্ধ হয়ে যায়। এর ফলে ব্রণ দেখা দেয়। সাধারণ সাবান ও জল শুধু ত্বকের ওপরের ভাগের ময়লাটুকুই পরিষ্কার করতে পারে।

ক্লিয়ারাসিল মেডিকেটেড ক্লেনজার— তেলতেলে ত্বকের জন্য বিশেষ ফর্মুলায় তৈরী

ক্লিয়ারাসিল মেডিকেটেড ক্লেনজার ত্বকের গভীরে গিয়ে পরিষ্কার করার ক্ষমতাযুক্ত এবং এতে আছে বিশেষ ঔষধিযুক্ত ফর্মুলা। এর তেল দ্রবকারী ক্ষমতা এবং পরিষ্কার করার উপাদানগুলি লোমকূপের মুখ খুলে দেয় এবং ত্বকের গভীরে গিয়ে লুকোনো তেল ও ময়লা বার করে আনে।

প্রমাণের জন্য, এই তুলোর পরীক্ষাটি করে দেখুন।

প্রথমে আপনার মুখটি যথারীতি ধুয়ে নিন। এবার কিছু তুলো ক্লিয়ারাসিল মেডিকেটেড ক্লেনজার দিয়ে ভিজিয়ে নিন। এটি দিয়ে মুখ অর্থাৎ, নাক, কপাল, গাল, থুতনীর আসেপাশে মুছে নিন।

ময়লা দেখতে পেলেন তো? এতেই প্রমাণ হয় সাধারণ সাবান ও জল লুকোনো তেল ও ময়লা পরিষ্কার করতে সফল হয় না, কিন্তু ক্লিয়ারাসিল মেডিকেটেড ক্লেনজার কত সহজে তা করেছে।

রক্ষাপ্রদ ঔষধিক্রিয়া ত্বকের সমস্যার সমাধান করেই চলে।

আপনার ব্যবহারের পরেও ক্লিয়ারাসিল মেডিকেটেড ক্লেনজার ঘণ্টার পর ঘণ্টা আপনার ত্বককে রক্ষা করে চলে।

সবচেয়ে ভাল ফল পেতে হলে:
দিনে দুবার বা তিনবার ব্যবহার করুন।

ক্লিয়ারাসিল
মেডিকেটেড ক্লেনজার

OBM-3362-BEN

বাহাদুর ছেলে কাঞ্চা

কুশল রায়

ভাল নাম চন্দ্রবাহাদুর রাই। ডাকনাম কাঞ্চা। বয়স বারো। কিন্তু এত অল্প বয়সেই এই খুদে নেপালি ছেলেটিকে সবাই তাক লাগিয়ে দিয়েছে। সম্প্রতি শিখর মাউন্টেনিয়ারিং ক্লাব আয়োজিত বাঁকুড়ার শুশুনিয়া পাহাড়ে চার দিনের রকক্লাইম্বিং কোর্সে কাঞ্চা তার দ্বিগুণ-বয়স্ক দাদাদের সঙ্গে সমান তালে পাল্লা দিয়েছে। সাহসে এবং শারীরিক ক্ষমতায় অনেক সময় তাঁদের ছাপিয়েও গিয়েছে।

দার্জিলিং-এর ছেলে কাঞ্চা খুব ছেলেবেলায় বাবা-মা হারিয়ে দোকানে-দোকানে কাজ করত। গত বছর গোড়ার দিকে হিমালয়ান মাউন্টেনিয়ারিং ইনস্টিটিউটের ক্যান্টিনে একটা কাজ জুটে যায়। কিন্তু একদিন দেরি হওয়ায় সেই কাজ খোয়াতে হল। ভারী স্ফূর্তিবাজ ছেলে কাঞ্চা। কয়েকদিনের মধ্যেই সব দুঃখ ভুলে গিয়ে একদিন সকালে ওই ইনস্টিটিউটের ভাইস প্রিন্সিপাল সুভাষ রায়ের বাড়ির লনে ডিগবাজি দিতে লাগে। সুভাষবাবু এই খুদে ছেলেটির কেরামতি দেখে তাকে শুধু পাকড়াওই করলেন না, তার বাবা-মা নেই জেনে নিজের বাড়িতে থাকার ব্যবস্থা করে দিলেন। এখন কাঞ্চা সুভাষবাবুর কাছে পড়াশোনা শেখে আর বাড়ির টুকিটাকি কাজকর্ম করে।

সুভাষবাবু এই কোর্সের চিফ অ্যাডভাইসর ছিলেন। পাহাড়ে চড়ায় কাঞ্চার সাহস আর উৎসাহ দেখে তিনি কাঞ্চাকে নিয়ে এসেছিলেন। কোর্সের আর দুই শিক্ষক কৃতী পর্বত-আরোহী অমূল্য সেন এবং উজ্জ্বল গাঙ্গুলি কাঞ্চার সাহস আর ক্ষমতা দেখে মুগ্ধ। সুভাষবাবু কাঞ্চাকে দিয়ে দেখিয়েছেন কীভাবে পাহাড়ে রেসকিউ করা হয়। এই অংশটাই ছিল এই কোর্সের সবচেয়ে শক্ত কাজ।

এই চারদিনের কোর্সে কলকাতা এবং আশপাশ থেকে ৫০ জন যোগ দেন। আর প্রথম দিনেই পরিশ্রম সহ্য করতে না পেরে তিন-চার জন ক্যাম্প থেকে চলে যান। কাঞ্চা কিন্তু ক্যাম্পের প্রতিটি নিয়ম মেনে চলেছে, সবরকম কসরত শিখেছে। আর তার বয়স এত কম হলেও শিক্ষকেরা তার প্রতি কোনও নিয়ম শিথিল করেননি।

চারদিনের যে-কোনও একদিনের প্রোগ্রাম বললে তোমাদের বুঝতে সুবিধে হবে সেটা কেমন এবং কতটা কঠিন। ভোর চারটে-পনেরোতে বেড-টি। পাঁচটা থেকে সাড়ে পাঁচটা পিটি। এরপর বাদাম আর হরলিক্স খেয়ে ছ'টা থেকে ন'টা পর্যন্ত টানা রকক্লাইম্বিং অনুশীলন। ন'টা থেকে সাড়ে ন'টা ব্রেকফাস্ট। সাড়ে ন'টা থেকে সাড়ে বারোটা আবার একই অনুশীলন। দুপুর একটা থেকে আড়াইটে লাঞ্চ ব্রেক। আড়াইটে থেকে সাড়ে চারটে থিওরেটিক্যাল ক্লাস। যার মধ্যে আছে ম্যাপরিডিং, পাহাড়ের ইতিহাস এবং পরিভাষা বা টারমিনোলজি, পাহাড়ে চড়ার সাজসরঞ্জামের সঙ্গে পরিচয় হওয়া ইত্যাদি। এরপর চা-জলখাবার খেয়ে দু ঘণ্টার জন্য পর্বত আরোহণের ওপর ফিল্ম শো। রাত দশটার মধ্যে ডিনার সেরে তাঁবুতে খড়ের গাদায় ঘুম।

শুধু পাহাড়ে চড়াতেই নয়, কাঞ্চা সবার মন জয় করে নেয় তার ফুর্তির মেজাজে। এই কড়া রুটিনের মাঝে যে বাড়তি সময়টুকু ছিল, নেপালি নাচ-গানে কাঞ্চা সবাইকে মাতিয়ে রাখত।

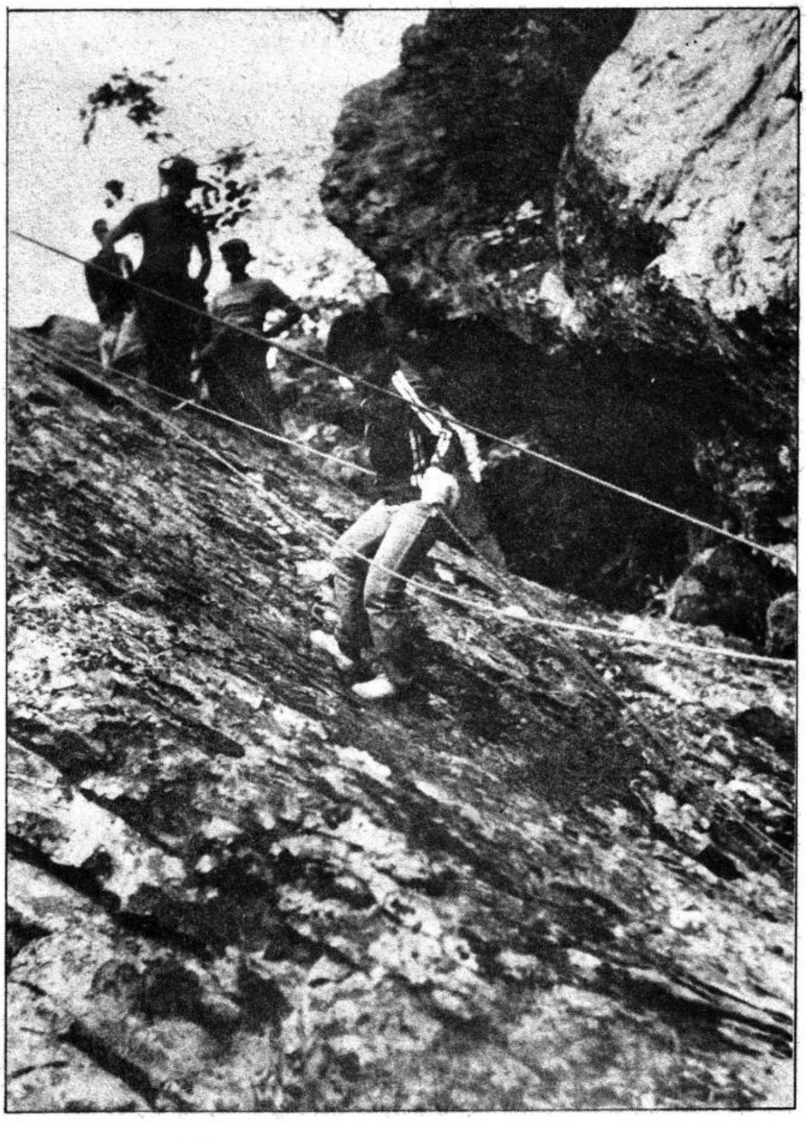

ঝাও-ঝড়ে ফ্রস্ট ফিনিশ

নৃপতি চৌধুরী

চিন্তায় পড়লেন মর্টেন ফ্রস্ট। ব্যাডমিন্টন-বিশ্বের এক নম্বরে মোটামুটি শান্তিতে ছিলেন তিনি। মাঝে-মাঝে হ্যান্ জিয়ান, লুয়ান জিন, লিয়েম সুই কিং, প্রকাশ পাড়ুকোন নামের ঢেউগুলো তাঁর লম্বা শরীরের মতো দীর্ঘ অস্তিত্বে ধাক্কা দিয়েছে। ধাক্কাগুলো অবশ্য 'মিঠে' এবং 'কড়া' দু'রকমই ছিল। তবে এবার অল-ইংল্যাণ্ডে, ধাক্কায় একেবারে ধসিয়ে দিলেন কুড়ি বছরের টগবগে তরুণ চিনের ঝাও জিয়ানহুয়া। সত্যিই একটু মুশকিলে পড়েছেন ফ্রস্ট। ঝাও নামক ঝড়টিকে ঠিক সামলাতে পারছেন না। গত তিনটি সাক্ষাৎকারে ফ্রস্টকে ফুঁ দিয়ে উড়িয়ে দিয়েছেন সদ্য কৈশোর-উত্তীর্ণ তরুণটি।

গত নভেম্বরে স্কটিশ ওপেন এবং জানুয়ারিতে জাপান ওপেনে ঝাওয়ের কাছে হারার পর থেকেই 'ঝাও-আতঙ্কে' ভুগছিলেন ডেনমার্কের বিখ্যাত ব্যাডমিন্টন খেলোয়াড় মর্টেন ফ্রস্ট হ্যান্সেন। অল-ইংল্যাণ্ড ফাইনালে ফ্রস্ট মনে-মনে চাইছিলেন ঝাওয়ের মুখ আবার যেন না দেখতে হয়। কিন্তু সেমিফাইনালে ইন্দোনেশিয়ার লিয়েম সুই কিংকে ১৫-১০, ১৫-৫ পয়েন্টে হারিয়ে ফাইনালে হাজির হলেন ঝাও। আগের দুটি হারের বদলা নেবার জন্যে, সুতরাং ফ্রস্টকে তৈরি হতেই হল। প্রথম গেমে ঝড়ের গতিতে ফ্রস্ট 'লিড' নিলেন ৯-০ পয়েন্টে। এবং গেম জিতলেন ১৫-৬ পয়েন্টে। কিন্তু শুরু দেখেই যাঁরা ফ্রস্টের সম্ভাবনা নিয়ে উচ্ছ্বসিত হয়েছিলেন, তাঁদের নিরাশ করলেন চিনের এই অসাধারণ বাঁ-হাতি খেলোয়াড়টি। দ্বিতীয় গেম আরম্ভ হওয়ামাত্র আক্রমণ শুরু করলেন ঝাও। ধাতস্থ হবার আগেই ১-৮ পয়েন্টে পিছিয়ে পড়লেন ফ্রস্ট। শেষ পর্যন্ত ১০-১৫ পয়েন্টে দ্বিতীয় গেম হারলেন।

সুতরাং তৃতীয় গেম শুরু হল মান বাঁচানোর চেষ্টায় চোখ-ধাঁধানো লড়াই। কিংবা আরও পরিষ্কার করে বলা যায়, এক নম্বর থাকার এবং এক নম্বর হবার লড়াই। বিশেষজ্ঞরাও শেষ পর্যন্ত চোখ রগড়ে বলতে বাধ্য হয়েছেন, "এমন রুদ্ধশ্বাস ম্যাচ অল-ইংল্যাণ্ড চ্যাম্পিয়ানশিপে খুব কমই হয়েছে।" ফ্রস্টের যাবতীয় অতীত অভিজ্ঞতার বিরুদ্ধে সমান তালে পাল্লা দিলেন তারুণ্যে উদ্দীপ্ত ঝাও। ফ্রস্টের গতি, কোর্ট কভারিং, স্ম্যাশের জবাবে ড্রপশট, ফ্লিক, প্লেসিং আর নেট-প্লের কারিকুরিতে ঝাও মুগ্ধ করলেন দর্শকদের। তুমুল লড়াই এসে দাঁড়াল ১৩-১৩ পয়েন্টে। ফলাফলই বলে দেবে এই যুদ্ধের উত্তেজনা কোন্ পর্যায়ে পৌঁছেছিল। টাই ভাঙার জন্যে সুতরাং লড়াই গড়াল আরও পাঁচ পয়েন্ট। ফ্রস্টের সার্ভিস ভাঙল শুরুতেই। এবং ঝাও এগোলেন ৩-০ পয়েন্টে। ফ্রস্ট লড়াইয়ে ফিরলেন পরপর দুটি পয়েন্ট নিয়ে। কিন্তু শেষরক্ষা হল না। ১৫-১৮ পয়েন্টে হার মানলেন গতবারের চ্যাম্পিয়ান এবং এবারের শীর্ষ-বাছাই মর্টেন ফ্রস্ট।

ঝাও জিয়ানহুয়া বিশ্ব-চ্যাম্পিয়ান হবার সঙ্গে সঙ্গে পরিসংখ্যানে হুমড়ি খেয়ে পড়ল কিছু আগ্রহী চোখ। জানা গেল, ১৯৬৮ সালে ইন্দোনেশিয়ার রুডি হরতনো যখন বিজয়ী হয়েছিলেন, তখন তাঁর বয়স ছিল মাত্র সতেরো বছর। কমবয়সী চ্যাম্পিয়ান হিসেবে ঝাও হলেন দ্বিতীয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে অল-ইংল্যাণ্ডে বাঁ-হাতি চ্যাম্পিয়ান হিসেবে ঝাও হলেন এক নম্বর।

সবচেয়ে মজার কথা, ঝাও কিন্তু একদমই প্র্যাকটিস করতে চান না। ওঁকে কোর্টে হাজির করতে কর্তৃপক্ষকে হিমসিম খেতে হয়। একমাত্র প্রতিভাবানরাই বোধহয় এমন হতে পারেন।

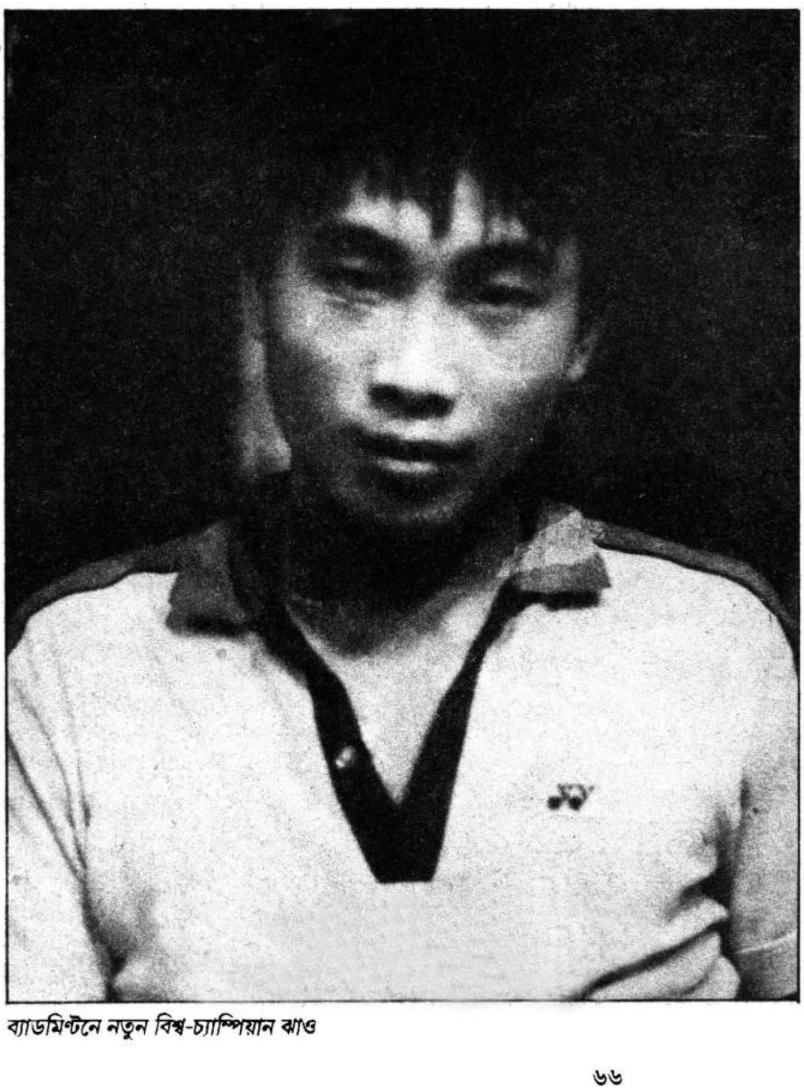

ব্যাডমিন্টনে নতুন বিশ্ব-চ্যাম্পিয়ান ঝাও

ডবল P মানে P ডবল পাওয়ার

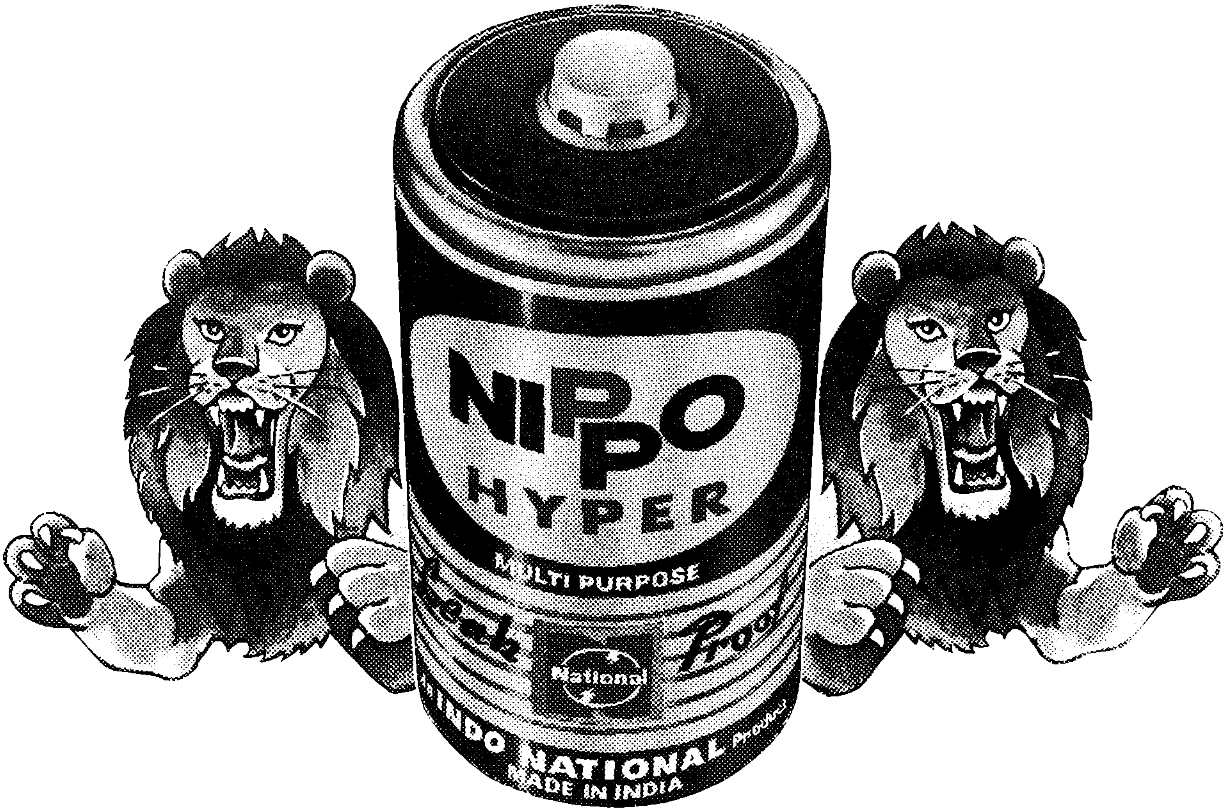

নিপ্পো

হাইপার ও সুপার

লিক প্রুফ ব্যাটারী

যখন অন্যান্য ব্যাটারী লিক করতে ও শেষ হতে সুরু করে, তখন ধাতব আবরণ যুক্ত নিপ্পো হাইপার ও সুপার বিনা বিরতিতে চালু থাকে। এটা হ'ল ঐ ডবল প্রতিরোধক ব্যবস্থা, যা' এই ব্যাটারীকে দেয় ডবল শক্তি—একটি আঁটসাটো ধাতব জ্যাকেটের ভেতরে একটি মজবুত ভিনাইল টিউব শক্তি প্রবাহকে অবিরাম ও শক্তিশালী করে রাখে।

অভিজ্ঞ ইঞ্জিনীয়ারদের তদারকীতে শ্রেষ্ট মানের কাঁচা উপাদানে নিপ্পো প্রস্তুত করা হয়। গত ১১ বছর ধরে ক্রেতাদের পছন্দের তালিকায় সেরা জিনিসটি এখন তার ১০০ কোটি তম সেল উৎপাদনের উৎসব পালন করছে।

এ ছাড়া রয়েছে অপ্রতিদ্বন্দী বৈশিষ্টগুলি :

- টপ সীল, কারখানা-তাজা শক্তির গ্যারেন্টি দেয়।
- ISI মার্কা—গুণমান সম্পর্কে আপনার ভরসা।
- জাপানের ন্যাশনাল থেকে বিশ্ব-শ্রেণীর প্রযুক্তিবিদ্যায় প্রস্তুত।
- আপনার কাছে পৌঁছবার আগে প্রতিটি ব্যাটারী-ইলেকট্রনিক উপায়ে পরীক্ষিত।
- UM-1, UM-2, UM-3—সব ক'টি জনপ্রিয় সাইজে পাওয়া যায়।

cverest/d85/INL/60 ben

স্নেহ
নিমেষে গুলে যায় এমন স্কীমড্ মিল্ক পাউডার
স্নেহ স্কীমড্ মিল্ক পাউডার। শুধু জলে দিলেই হ'ল...নিমেষে গুলে যায়! গরম জল দরকার নেই। দলা পাকায় না। কোনো ঝঞ্ঝাট নেই। পুষ্টিতে ভরা কম চর্বিযুক্ত এই দুধ সরাসরি ব্যবহার করুন— চা বা কফি, দই বা মিষ্ঠান্ন বানানোর জন্যে।
স্নেহ স্কীমড্ মিল্ক পাউডার। পুষ্টিগুণে ভরা এই সুবিধাজনক প্যাক হাতের কাছে রাখুন।
মধ্য প্রদেশ দুগ্ধ মহাসংঘের উৎকৃষ্ট ডেয়ারী উৎপাদন
Sneha
SKIMMED MILK POWDER
Spray Dried □ Instantly Soluble
স্নেহ-প্রকৃতির সস্নেহ উপহার!